বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ

প্রথম সেমেস্টার

B-CORE-103

বাংলা ভাষাতত্ত্ব

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

ডাইরক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় সমিতি

১. বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সভাপতি
২. অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৩. অধ্যাপক নন্দিনী ব্যানার্জী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৪. অধ্যাপক আদিত্যকুমার লালা, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৫. ড. রাজশেখর নন্দী, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৬. ড. শ্রাবন্তী পান, সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৭. অধিকর্তা, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় — আহ্বায়ক

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর ২০২১

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত।
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।
কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ- সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) **Manas Kumar Sanyal**,Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright is reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials have been composed by distinguished faculty from reputed institutions, utilizing data from e-books, journals and websites.

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

প্রতি পত্রের পূর্ণমান- ১০০

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস), এম.এ

প্রথম সেমেস্টার

B-CORE-103

শিরোনাম : বাংলা ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ১ (সময় ৫ ঘণ্টা)

একক - ১ : ভাষার সংজ্ঞা স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য
একক - ২ : বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা
একক - ৩ : বাংলা ভাষার জন্ম ও ইতিহাস
একক - ৪ : বাংলা ভাষার যুগবিভাজন ও বৈশিষ্ট্য (প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক ও অত্যাধুনিক)
একক - ৫ : বাগ্‌যন্ত্র

পর্যায় গ্রন্থ : ২ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক - ৬ : ভাষাবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ (ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব,বাক্যতত্ত্ব,শব্দার্থতত্ত্ব)
একক - ৭ : ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান
একক - ৮ : বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব
একক - ৯ : বাংলা ভাষায় বিদেশি প্রভাব

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক - ১০ : বাংলা রূপতত্ত্ব (নামশব্দ,অনুসর্গ, বিভক্তি, অব্যয় ও প্রত্যয়)
একক - ১১ : চমস্কির সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ (সাধারণ ধারণা)
একক - ১২ : বেতার, টিভি, সংবাদপত্রের ভাষা ও বাংলা বিজ্ঞাপনের ভাষা
একক - ১৩ : রবীন্দ্রনাথের ভাষাচর্চা

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ (সময় ৩ ঘণ্টা)

একক - ১৪ : ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সুনীতিকুমার
একক - ১৫ : সুকুমার সেনের বাংলাভাষা চর্চা
একক - ১৬ : আই. পি. এ

সূচিপত্র

B-CORE-103

শিরোনাম : বাংলা ভাষাতত্ত্ব

প্রথম পত্র	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১	১	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	ভাষার সংজ্ঞা স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য	১-৩
	২	ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা	৪-৬
	৩	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	বাংলা ভাষার জন্ম ও ইতিহাস	৭-১০
	৪	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস ও ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	বাংলা ভাষার যুগ বিভাজন ও বৈশিষ্ট্য (প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক ও অত্যাধুনিক)	১১-২৫
	৫	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	বাগ্‌যন্ত্র	২৬-২৯
পর্যায় গ্রন্থ-২	৬	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	ভাষাবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ (ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব)	৩০-৩২
	৭	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান	৩৩-৩৫
	৮	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব	৩৬-৩৮
	৯	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	বাংলা ভাষায় বিদেশি প্রভাব	৩৯-৪৩
পর্যায় গ্রন্থ-৩	১০	ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	বাংলা রূপতত্ত্ব (নামশব্দ,অনুসর্গ, বিভক্তি, অব্যয় ও প্রত্যয়)	৪৪-৬০
	১১	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	চমস্কির সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ (সাধারণ ধারণা)	৬১-৬৩
	১২	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	বেতার, টিভি, সংবাদপত্রের ভাষা ও বাংলা বিজ্ঞাপনের ভাষা	৬৪-৬৭
	১৩	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	রবীন্দ্রনাথের ভাষাচর্চা	৬৮-৭১
পর্যায় গ্রন্থ-৪	১৪	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সুনীতিকুমার	৭২-৭৫
	১৫	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	সুকুমার সেনের বাংলা ভাষা চর্চা	৭৬-৭৮
	১৬	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	আই. পি. এ	৭৯-৮৪

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ১

ভাষার সংজ্ঞা স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

বিন্যাস ক্রম ঃ

৩.১.১.১ : ভূমিকা

৩.১.১.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.১.১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.১.১.১ : ভূমিকা

'মানুষের ভাষাই হল তার আত্মা এবং তার আত্মাই হল তার ভাষা' — আধুনিক জার্মান মনীষী হুমবোল্টের এই উক্তির মধ্যে দার্শনিকতা আছে সত্য। সেই সঙ্গে এও সত্য যে ভাষার সঙ্গে মানুষের আত্মার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানুষের আত্মার গভীরতম প্রদেশে ভাষার উৎপত্তি। কিন্তু এই ভাষার উৎপত্তি কবে থেকে সে বিষয়ে আজও কোনও স্বচ্ছ ও সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা গড়ে ওঠেনি। অনুমান ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে নানা মতামত গড়ে উঠেছে। ভাষা ঈশ্বরের সৃষ্টি এমন একটা মতামত সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক চিন্তাবিদেরা মনে করেন ভাষা মানুষেরই সৃষ্টি। ঈশ্বরের নয়। সমাজ যখন তৈরী হল কাজের ভিত্তিতে কাজের সূত্র ধরে তখন মানুষ একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের তাগিদেই ভাষা সৃষ্টি করেছিল। এ বিষয়েই মার্কস মন্তব্য করেন — "Language like conciousness, only arises from the need, the necessity of intercourse of other man."

> *আধুনিক জার্মান মনীষী হুমবোল্ট বলেছেন — 'মানুষের ভাষাই হল তার আত্মা এবং তার আত্মাই হল তার ভাষা'। আধুনিক চিন্তাবিদেরা মনে করেন ভাষা মানুষের সৃষ্টি, ঈশ্বরের নয়। ভাষা হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সেতু। আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন — "মানুষের উচ্চারিত বহুজনবোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — "মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন কোন বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।"*

বিবর্তনশীল মানুষ এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যেখানে They had something to say each other, তখন তাদের বিশেষ ইন্দ্রিয়গুলি বাগেন্দ্রীয় হিসাবে সক্রিয় হয়ে উঠল। অতএব বলাই যায় সামাজিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনেই

ভাষার সৃষ্টি। একমাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজন বা জৈব বৃত্তি-ই ভাষা সৃষ্টির কারণ নয়। যদি তা হতো, তবে সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যেই ভাষার উন্মেষ হতো। আসলে ব্যবহারিক প্রয়োজন তো আছেই সেই সঙ্গে উন্নত জীব মানুষ তার উন্নত ভাব ও ভাবনাকে প্রকাশ করতেই ভাষাসৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ ভাষা হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সেতু। আচার্য সুকুমার সেনের বক্তব্যেও এ কথার সমর্থন মেলে - "মানুষের উচ্চারিত বহুজনবোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা" (ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃ-২)। ড. সেন আরও বলেছেন একজন মানুষের স্পৃহা বা উত্তেজনা আর একজন মানুষের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করিয়ে সেইরূপ স্পৃহা বা উত্তেজনার অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করাই ভাষার প্রথম ও প্রধান কাজ। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন "মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন কোন বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।" (ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ-২)।

ভাষাবিজ্ঞানী স্টার্টেভান্ট ভাষার বিজ্ঞানসম্মত ও সর্বজনগৃহীত সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন — "A language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a social group co-operate and interact." (An Introduction to Lingiustic Science)

অতএব বলা যেতে পারে ভাষা হল মানুষের উচ্চারিত প্রণালীবদ্ধ ধ্বনি-সংকেত যা দিয়ে এক একটি বিশিষ্ট সমাজ পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারে। যেমন, বাংলা ভাষায় রাম মাকে বললো, 'মা খিদে পেয়েছে।' মা বললেন, 'চল দিচ্ছি।' রামের কথায় মা তার মনের ভাব জানতে পারলেন। এবং যথাযথ উত্তর দিয়ে তার নিজের মনের ভাব জানালেন। এখানে রাম ও মা দুটি পৃথক মানুষ। তারা কতকগুলি ধ্বনি বা শব্দ যথাযথ ব্যবহার করে তার সাহায্যে পারস্পরিক ভাববিনিময় করলো, একে বলা হয় ভাষা।

ভাষার সংজ্ঞা থেকে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। প্রথমত ভাষা হল কতগুলি ধ্বনির সমষ্টি। এই ধ্বনিগুলি অবশ্য মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হতে হবে। মানুষ হাততালি দিয়ে অথবা অন্য কোনও উপায়ে অনেক সময় মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে, তাকে ভাষা আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ এগুলি বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি নয়। দ্বিতীয়ত, ভাষার ধ্বনিগুলি কেবলমাত্র বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হলেই চলবে না, ধ্বনিগুলিকে কোনও বিশেষ বস্তু বা প্রাণী অথবা ভাবের প্রতীক হতে হবে। তৃতীয়ত, ধ্বনি কখনোই কার্যকারণসূত্রে কোন বস্তু বা প্রাণীর অথবা ভাবের প্রতীক নয়। মানুষ তার নিজস্ব খেয়ালখুশি মতো তাদের ব্যবহার করে। যেমন 'জল' দ্বারা বাংলায় যে তরল বস্তুকে নির্দেশায়িত করা হয়, ইংরেজি ভাষায় তাকে বলা হয় 'water', হিন্দিতে 'পানি', লাতিনে 'আকোয়া'। চতুর্থত, ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগত প্রতীকগুলি প্রথমে খেয়াল খুশি মতো নির্বাচন করা হলেও সমাজে তা স্বীকৃত হয়ে গেলে শব্দমধ্যে বা বাক্যমধ্যে এদের আর খেয়াল মত ব্যবহার করা চলে না। তখন এদের ব্যবহারে একটা প্রণালীবদ্ধ নিয়ম থাকে। এর ব্যত্যয় হলে ভাষা তার নিজস্ব অর্থ হারিয়ে ফেলে।

৩.১.১.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে'

৩.১.১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ভাষা কাকে বলে ?

২। সুকুমার সেন ভাষা সম্পর্কে কি বলেছেন ?

পর্যায় গ্রন্থ-১

একক-২

বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা, অত্যাধুনিক বাংলা ভাষা

বিন্যাস ক্রম :

৩.১.২.১ : ভূমিকা

৩.১.২.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.১.২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.১.২.১ : ভূমিকা

অনেকে বলেন খ্রি: পূ: যুগেও বাঙালির অস্তিত্ব ছিল। শুধু ভারতে নয়, এখনকার পাকিস্তান, আফগানিস্থান ইত্যাদি দেশেও। তাই যদি হয়, তবে বলা যাবে বাঙালিরা একবিংশ শতকেও সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। পৃথিবীর সব প্রান্তেই এখন বাঙালির জয়জয়কার। সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো, ব্যবসা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সবকিছুতেই বাঙালি চলে এসেছে প্রথম সারিতে। এমনকী লোকসংখ্যার বিচারেও। ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে তো পৃথিবীতে চতুর্থ স্থানে রয়েছে এই বাংলা ভাষা।

বাঙালি একটি মিশ্র জাতি। এই ভারতে তথা বাংলায় আর্য আসার পরেই তারা তাদের মৌলিকতা হারিয়েছে। আমরা তো সবাই জানি আর্যরা আসার আগে এই ভারতের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে বসবাস করত অনার্যরা। অর্থাৎ দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, ভোট-চীনীয় ইত্যাদি বংশের মানুষজন। এই আর্যরা বঙ্গভূমিতে এসে সবাই যে একেবারেই বাঙালি হয়ে গেল তা হতে পারে না। বরঞ্চ হতে পারে বঙ্গভূমিতে বসবাসকারী অনার্যরা, আর্যদের সংমিশ্রণে বাঙালি হয়ে গিয়েছিল। এই মিশ্রণ কিন্তু একদিনে হয়নি, অনেকদিন ধরে চলেছিল। বিবাহসূত্রে রক্ত মিশ্রণের পাশাপাশি সংস্কৃতির মিশ্রণও হয়েছিল এইরকম অনুমান করা হয়।

'বঙ্গ' শব্দের সর্বপ্রথম উল্লেখ আছে সেই কবেকার বেদের যুগে। মূলত ঐতরেয় আরণ্যকে। এই বঙ্গে যারা বসবাস করত তারাই বঙ্গবাসী বা বাঙালি। বঙ্গদেশের যে প্রধান নদী গঙ্গা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। খ্রিস্টপূর্ব যুগে বিদেশি লেখকদের লেখা 'আরগনটিকা', 'জর্জিকাস' প্রভৃতি গ্রন্থে 'গঙ্গা-রাঢ়' দেশের নাম আছে। আছে এখানে বসবাসকারী মানুষদের বীরত্বের কথা। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় খ্রিস্টপূর্ব যুগেই বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তাদের ভাষা বাংলা কি না তা কোথাও লেখা নেই। সিন্ধু সভ্যতার বিবরণে যে সব সিলমোহর পাওয়া গেছে তাতেও আছে বাঙালি সংস্কৃতির চিহ্ন। অর্থাৎ বাঘ সিংহের ছবিই বিশেষজ্ঞদের এই ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। এ ছাড়া ওখানকার মানুষদের সর্ষের তেলের ব্যবহার বাঙালি মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সভ্যতার মানুষদের রেশমবস্ত্র, চাল, মাছ ইত্যাদির ব্যবহার দেখে অনুমান করা হয়, এখানেও বাঙালি সংস্কৃতির ছোঁয়া ছিল।

বাল্মীকি রচিত রামায়ণে অঙ্গ, বঙ্গ মগধ ইত্যাদির কথা আছে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বঙ্গকে দেশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ব্যাসদেব তাঁর মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম-এর কথা বলেছেন। এখানে বঙ্গ কোনও দেশের নাম নয়। বঙ্গ হল রানি সুদেষ্ণার পুত্র। কালিদাসের রচনায় তো দক্ষিণ রাঢ়ের কথা আছেই, চিনা পর্যটক হিউয়েন সাঙও তাঁর রচনায় বঙ্গদেশ, বাঙালি ইত্যাদির উল্লেখ করে গেছেন। এর থেকে অনুমান করা যায় এই বিশাল ভূখণ্ডে বাঙালি যেমন ছিল, তাদের ভাষাও নিশ্চয় একটা ছিল। কিন্তু সেটা কোন ভাষা সেটাই প্রশ্ন।

বিশেষজ্ঞদের অনুমানে সেইসময়ের বাঙালিরা নিশ্চিতরূপেই ছিল বীরত্বের বাঙালি। তাদের জীবিকা হিসেবে নীহাররঞ্জন জানিয়েছেন, কৃষিকাজই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। নদীমাতৃক বাংলাদেশে কৃষিকাজকেই তারা বেছে নিয়েছিল। তবে এর পিছনে ছিল আর্যরা। এরাই যেহেতু অনার্য (অস্ট্রিক) বঙ্গবাসীদের আর্যে রূপান্তরিত করেছিল, তেমনই কৃষিকাজেও হাত মিলিয়েছিল। অনার্য অস্ট্রিকরা আর্য হয়ে গেলেও কিন্তু অস্ট্রিকদের পুজো-আচ্চা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ছাড়তে পারেনি। 'আর্য-বাঙালি' উৎসের পিছনে অনেকে আবার অস্ট্রিক-দ্রাবিড় মিশ্র সংস্কৃতির স্রোতও দেখতে পেয়েছেন। যাই হোক আর্য হয়েও এই বাঙালিরা কিন্তু অনার্য সংস্কৃতির গাছ, পাথর ইত্যাদি পুজোর ব্যাপারটা ছাড়তে পারেনি। শুধু তাই নয়, বিয়ে-অন্নপ্রাশন বিভিন্ন উৎসবের আচার-আচরণ তো অনার্যভাবনা থেকেই প্রসূত। তাই অনেকে বলেছেন অনার্যদের না পালটে আর্যরাই অনার্যদের ধর্ম, সংস্কৃতি, অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে নিজের করে নিয়েছিল। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এখানকার বাঙালি জাতির উদ্ভব হিসেবে সেই অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠী বা অস্ট্রিকভাষী মানুষদেরই দায়ি করেছেন। এখানকার বাঙালিরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর আচার-আচরণ রীতিনীতি সচল রাখলেও ভাষাটা কিন্তু তারা পেয়েছিল আর্যদের। এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার স্পষ্টই বলেছেন—

> "... অনার্য্যের ধর্ম মরিল না, অনার্য্যের ইতিহাস-পুরাণও মরিল না;
> ক্রমে অনার্য্যের ধর্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতা বাদে, পৌরাণিক
> পূজা দিতে, যোগচর্য্যার তান্ত্রিক মতবাদ ও অনুষ্ঠানে আর্য্যদের
> বংশধরদিগের দ্বারাও গৃহীত হইল। আর্য্য ও অনার্য্য, এই টানা ও
> পড়িয়ান মিলিইয়া হিন্দু সভ্যতার বস্ত্রবয়ন করা হইল। উত্তর ভারতের
> গঙ্গাতীরের আর্য্য সভ্যতার পত্তন এইরূপে হইল। এই সভ্যতার আর্য্য
> অপেক্ষা অনার্য্যের দানই অনেক বেশি, কেবল আর্য্যদের ভাষা ইহার বাহন হইল।"

অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষাও বেঁচে আছে মানুষের মুখে, লেখকের লেখায়। বিভিন্ন উপভাষাকে টপকে বাংলা বেঁচে আছে আদর্শ কথ্য বাংলায়। শিষ্টজনের মুখে, পত্র পত্রিকায়, লেখকের রচনায়।

ঐতিহাসিকদের মতে, বাংলা ভাষার মূলে আছে আর্যরা। অনুমান করা হয় খ্রি: পূ: ১৫০০ অব্দে আর্যরা ভারতবর্ষে আসে। সেই সময় ভারতে বসবাস করত অনার্যরা। তাদের ভাষা, আচার-আচরণ, খাওয়া-দাওয়া খুব উন্নত ছিল না। বুদ্ধিও সেইরকম ছিল না। এই সুযোগটাই নিয়েছিল আর্যরা। আস্তে আস্তে তাই তারা দখল নিয়েছিল গোটা ভারতবর্ষ। আর্যদের বৃত্তি ছিল পশুপালন করা। যাযাবরী কায়দায় তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ালেও, তাদের ভাষা ও সাহিত্য ছিল খুবই শক্তিশালী। ফলে অনার্যদের উপর প্রভাব ফেলতে তাদের বিশেষ অসুবিধা হয়নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে তারা আস্তে আস্তে পুরো ভারতবর্ষের উপর প্রভাব ফেলতে থাকে।

বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাষাগত অনেক পার্থক্য ছিল ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যে মিলটাই ছিল বেশি। অনুমান করা হয় তারা কথা বলত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায়। তারা প্রথম দিকে রচনা করেছিল বিভিন্ন ধরনের দেব গীতামূলক কাব্য। যেমন— ঋগ্বেদ সংহিতা, বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি। যাই হোক এই বৈদিক দেবগীতিমূলক ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর হঠাৎ করে হয়নি। এর জন্যে অনেক সময় লেগেছিল। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সেটা প্রায় আড়াই হাজার বছর।

৩.১.২.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ
২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত
৩. ড. রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা
৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)
৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)
৬. সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ
৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।'

৩.১.২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করো।

২. অধ্যাধুনিক বাংলা ভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ৩

বাংলা ভাষার জন্ম ও ইতিহাস

বিন্যাস ক্রম :

৩.১.৩.১ : ভূমিকা

৩.১.৩.২ : প্রাচীন বাংলা

৩.১.৩.৩ : মধ্য বাংলা

৩.১.৩.৪ : আধুনিক বাংলা

৩.১.৩.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.১.৩.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.১.৩.১ : ভূমিকা

পৃথিবীর সমস্ত ভাষাবংশের মধ্যে অন্যতম হল ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষাবংশ। শুধু ভৌগোলিক বিস্তারেই নয়, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতেও এই ভাষাবংশের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করেছে। বৈদিক সংহিতার সূক্তগুলি, ব্যাস-বাল্মীকির রামায়ণ-মহাভারত, কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি, হোমারের ইলিয়াদ-অদিসি ইত্যাদি ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের প্রাচীন সাহিত্যকীর্তি। তা ছাড়া আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, ইতালীয় তো আছেই। বাংলা ভাষার গর্ব এই যে, এই ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশেরই একটি ভাষা।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে বাংলা ভাষা কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমবিবর্তনের ধারায় রূপান্তরিত হয়েছে। জানা গেছে, মূল আর্য ভাষাভাষী মানুষ আনুমানিক খ্রি:পূ: ২৫০০ অব্দে রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দশটি ভাষাবংশের সৃষ্টি হয়। দশটি শাখার অন্যতম একটি হল ইন্দো-ইরানীয়। তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ইরানীয় আর্য, দরদীয় ও ভারতীয় আর্য ভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দুটি রূপ

প্রচলিত ছিল - কথ্যরূপ ও সাহিত্যিক রূপ। বেদ লেখা হয়েছিল সাহিত্যিক ভাষায়। আর কথ্য রূপের ছিল চারটি আঞ্চলিক উপভাষা। প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য। এই কথ্য উপভাষাগুলি লোকমুখে স্বাভাবিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই সূচনা ঘটল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার। প্রাচ্য থেকে প্রাচ্যা প্রাকৃত ও প্রাচ্য-মধ্যা প্রাকৃতের জন্ম হল। তারপর প্রাকৃত ভাষা বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে প্রাচ্যা থেকে মাগধী সাহিত্যিক প্রাকৃতের জন্ম হল। প্রাকৃতের বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে সাহিত্যিক প্রাকৃতের কথ্যরূপ থেকে জন্ম হল অপভ্রংশের এবং অপভ্রংশের শেষ স্তরে পাওয়া গেল অবহট্‌ঠ। এর পরে ভারতীয় আর্য ভাষা তৃতীয় যুগে (আ: ৯০০ খ্রী:) পদার্পণ করে। মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে পাওয়া গেল দুটি শাখা পশ্চিমা ও পূর্বী। তারপর পূর্বী শাখা থেকে জন্ম হল 'বঙ্গ-অসমিয়া' ও 'ওড়িয়া' ভাষার। অবশেষে বঙ্গ-অসমিয়া থেকেই সৃষ্টি হল বাংলা ভাষা।

পৃথিবীর সমস্ত ভাষাবংশের মধ্যে অন্যতম হল ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষাবংশ। ভৌগলিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতেও এই ভাষাবংশের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি প্রাধান্য লাভ করেছে। বাংলা ভাষার গর্ব এই যে, এই ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশেরই একটি ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দশটি ভাষাবংশের সৃষ্টি হয়। অবশেষে বঙ্গ অসমীয়া থেকেই সৃষ্টি হল বাংলা ভাষা।

বাংলা ভাষার জন্ম চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল :

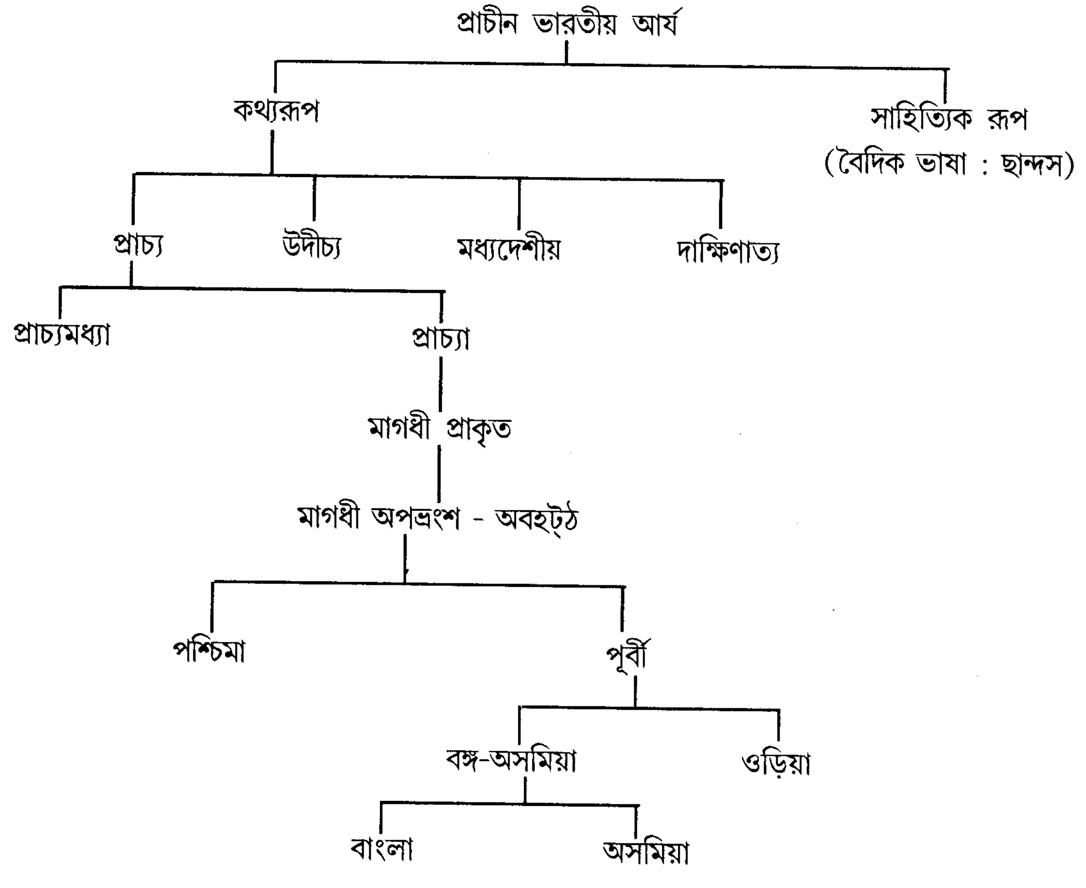

মাগধী প্রাকৃত বা মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাই ড. পরেশ চন্দ্র মজুমদার সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন যে, বাংলা ভাষা আদর্শ কথ্য প্রাকৃত থেকে সৃষ্টি। কিন্তু ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রীয়ার্সন প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ বলেছেন যে, মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকেই বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এই মতটিই অধিক প্রচলিত। আনুমানিক ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষার জন্ম।

জন্মকাল থেকে অদ্যাবধি বাংলাভাষার বিকাশকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

(১) প্রাচীন বাংলা ভাষা (Old Bengali = OB)

(২) মধ্য বাংলা (Middle Bengali = MB)

(৩) আধুনিক বাংলা (New Bengali = NB)

প্রশ্ন :

১। বাংলা ভাষা কোন ভাষা বংশেরই একটি ভাষা ?

২। অবশেষে বাংলা ভাষা কোন ভাষা থেকে সৃষ্টি হয় ?

৩.১.৩.২ : প্রাচীন বাংলা

এই পর্বের সময়সীমা আনু: ৯৫০-১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ। তুর্কি আক্রমণের সময় থেকে (১২০২ খ্রি:) পরবর্তী নিদর্শনহীন অংশকে ধরা হয় না। ৯৫০-১২০০ খ্রি: পর্যন্ত ধরা হয়। এই পর্বে প্রাপ্ত নিদর্শন - 'চর্যাপদে', সর্বানন্দ রচিত 'অমরকোষের' টীকায় চার শতাধিক বাংলা প্রতিশব্দে, ধর্মদাসের 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডলে', 'শেকশুভদয়ার' গানে-ছড়ায়।

বৈশিষ্ট্য :

(১) পদান্তিক স্বরধ্বনির স্থিতি - ভণতি > ভণই

(২) ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন - ধর্ম > ধম্ম > ধাম

(৩) বিভক্তির স্থানে অনুসর্গের ব্যবহার - তোহোর অন্তরে = তোর তরে।

(৪) -এর/-অর/-র' বিভক্তি যোগে সম্বন্ধ পদ - **রুখের** তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।

৩.১.৩.৩ : মধ্য বাংলা

সময়সীমা — ১৩৫০-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ। এর নিদর্শন মেলে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, শাক্তসাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবতের অনুবাদ ইত্যাদিতে।

ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(১) আ-কারের পরবর্তী 'ই/উ' ধ্বনির ক্ষীণতা - বড়াঞি > বড়াই।

(২) সর্বনামের বহুবচনে কর্তৃকারকে 'রা' বিভক্তি - আহ্মারা > আমরা

(৩) অপিনিহিতির ব্যবহার - করিয়া > কইরা

(৪) ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল - 'র, এর' ইত্যাদি। যথা, '**রূপের** পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল'।

৩.১.৩.৪ : আধুনিকবাংলা

সময়কাল ১৭৬০ থেকে বর্তমানকাল। মানুষের মুখের ভাষাই এই পর্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তা ছাড়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দ থেকে আধুনিক যুগের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সমরেশ বসু প্রমুখের বিশাল রচনা সম্ভার এই ভাষার নিদর্শন। এর পাঁচটি উপভাষা রয়েছে — রাঢ়ী, বঙ্গালী, কামরূপী, ঝাড়খণ্ডী, বরেন্দ্রী। উল্লেখ্য ভাগীরথী তীরবর্তী বসবাসকারী মানুষের 'রাঢ়ী' উপভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে 'আদর্শ কথ্য বাংলা' (Standard Colloquial Bengali).

ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(১) ব্যাপকভাবে 'অভিশ্রুতি' প্রক্রিয়ার ব্যবহার, যেমন — করিয়া > কইর‍্যা > করে

(২) স্বরসঙ্গতি লক্ষণীয় - দেশী > দিশি

(৩) বহুপদী ক্রিয়ারূপ দেখা যায় - গান করা, খেলা করা

(৪) ইংরেজি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি বহু বিদেশি শব্দের ব্যবহার - চেয়ার, টেবিল, আলপিন, হাকিম, কুপন ইত্যাদি।

(৫) নতুন নতুন ছন্দোরীতি এবং গদ্যছন্দের ব্যবহার সম্প্রতি ঘটেছে।

৩.১.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে'

৩.১.১.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ভাষা কাকে বলে ?

২। সুকুমার সেন ভাষা সম্পর্কে কি বলেছেন ?

পর্যায় গ্রন্থ -১

একক -৪

বাংলা ভাষার যুগ বিভাজন ও বৈশিষ্ট্য
(প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক ও অত্যাধুনিক)

বিন্যাস ক্রম :

৩.১.৪.১	:	প্রাচীন বাংলা
৩.১.৪.১.১	:	ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.১.২	:	রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.১.৩	:	ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.২	:	আদি-মধ্য বাংলা
৩.১.৪.২.১	:	ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.২.২	:	রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.২.৩	:	ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৩	:	অন্ত্য-মধ্য বাংলা
৩.১.৪.৩.১	:	ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৩.২	:	রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৩.৩	:	ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৪	:	আধুনিক বাংলা
৩.১.৪.৪.১	:	ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৪.২	:	রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৪.৩	:	বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৪.৪	:	শব্দগ্রহণগত বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৪.৫	:	ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৫	:	আধুনিক বাংলা
৩.১.৪.৫.১	:	ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৫.২	:	রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৫.৩	:	ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য
৩.১.৪.৬	:	সহায়ক গ্রন্থ
৩.১.৪.৭ .	:	আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.১.৪.১ : প্রাচীন বাংলা (Old Bengali)

বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছর অতিক্রম করেছে। এই হাজার বছরে বাংলা ভাষার বহু পরিবর্তন হয়েছে। অনেক বৈচিত্র এসেছে। ওই পরিবর্তন ও বৈচিত্রকে সামনে রেখে বাংলা ভাষাকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। যেমন— প্রাচীন বাংলা, মধ্য বাংলা, আধুনিক বাংলা ও অত্যাধুনিক বাংলা। বাংলা ভাষার এই হাজার বছরের পথ পরিক্রমাকে ভাষাবিজ্ঞানীরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

যথা—

প্রাচীন বাংলা : (৯০০-১২০০, মতান্তরে ১৩৫০ খ্রি: পর্যন্ত)

মধ্য বাংলা : (১৩৫০-১৭৬০ বা ১৮০০ খ্রি: পর্যন্ত)

আধুনিক বাংলা : (১৮০০-বর্তমান কাল পর্যন্ত)

এই পর্বের বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধ সহজিয়াদের রচিত চর্যাপদ থেকে। এ ছাড়া আর যে সব রচনা থেকে প্রাচীন বাংলা ভাষার পরিচয় মেলে, সেগুলি হল—

ক. বৌদ্ধ কবি ধর্মদাসের --'বিদগ্ধমুখমণ্ডল'

খ. বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের - 'অমরকোষের টীকাসর্বস্ব'

গ. সেকশুভোদয়ার - কিছু গান ও ছড়া।

৩.১.৪.১.১ : ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. প্রাচীন বাংলা ভাষায় পদের শেষে অবস্থিত স্বরধ্বনি বজায় ছিল।

যেমন — ভণতি > ভণই, উত্থিত > উটঠিঅ > উঠি ইত্যাদি।

২. এই পর্বে যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণ ঘটেছে প্রাকৃতের স্তরেই। এ ছাড়া পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়েছে। উদাহরণ — জন্ম > জাম, কম্ম > কাম ইত্যাদি।

তবে সর্বত্র এই নিয়ম রক্ষিত হয়নি। যেমন — মধ্যেন > মঝেঁ (এখানে 'মাঝেঁ', হয়নি)

৩. প্রাচীন বাংলা ভাষায় স্বরসঙ্গতি ও সমীভবনের ধারা দেখা যায়। কিন্তু তা খুব অল্প দু'একটি শব্দে।

স্বরসঙ্গতি : দৃঢ় > দিঢ়ি

সমীভবন : নিশ্চল > নিচ্চল

('শ' 'চ' অর্থাৎ বিষম ব্যঞ্জন সমব্যঞ্জনে 'চ্চ' পরিণত হয়েছে।)

৪. এই পর্বে নাসিক্য ব্যঞ্জন অনেক ক্ষেত্রে লুপ্ত হয়েছে। তার ফলে স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে গেছে। যেমন — শব্দেন > সাঁদে ইত্যাদি। তবে স্বতোনাসিক্যীভবনের পরিচয় প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যায়। উদাহরণ — করহু = কর + হু > করহুঁ (হুঁ - স্বতোনাসিক্যীভবন)।

৫. প্রাচীন বাংলায় একাধিক স্বরধ্বনি একটি স্বরে পরিণত হয়নি। পাশাপাশি দুটি স্বর বা যৌগিক স্বরের উপস্থিতি বজায় ছিল। যেমন — উদাস > উআস।

৬. এই পর্বে ভাষায় শ্রুতিধ্বনি হিসেবে শব্দের মধ্যে 'য়' ও 'ব'-এর আগম দেখা গেছে।

যেমন— নিকট > নিঅডি > নিয়ড্ডি ('য়'-এর আগম), ত্রিভুবন > তিহুঅন > তিহুবন ('ব' আগম) প্রভৃতি।

৭. এই পর্বে 'ন' অ 'ণ' এর মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয়নি। আবার 'শ', 'স', 'ষ' এর মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য ছিল না। নাব-ণাবী, এখানে 'ন' ও 'ণ' দুইই ব্যবহৃত হয়েছে। আবার একই শব্দের বানানে কোথাও 'শ', কোথাও 'স' বা 'ষ' ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন — শূন > সূণ, সহজে > ষহজে, শবরী > সরবী ইত্যাদি।

৩.১.৪.১.২ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. এই পর্বে তিনরকম ভাবে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ গঠিত হত। যেমন— 'ল', 'ইলে' ও 'অন্ত' প্রত্যয় যোগ করে।

উদাহরণ — ল-দেখিল, ইলে-চড়িলে, অন্তে-বুড় + অন্তে = বুড়ন্তে ইত্যাদি।

২. যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহারও এই পর্বে দেখা যায়। যেমন—

দুহিল দুধু (দোয়া দুধ) প্রভৃতি।

৩. অনুসর্গ ও শব্দদ্বৈতের ব্যবহার প্রাচীন বাংলায় দেখা যায়। উদাহরণ—

ক. শব্দদ্বৈত - উঁচা উঁচা পাবত।

জে জে আইলা।

খ. অনুসর্গ - তোহোরে অন্তরে মোত্র খলিলি হাড়েরী মালা।

৪. ক্রিয়ারূপে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ এই পর্বের বাংলা ভাষায় দেখা যায়। অতীত কালে উত্তম পুরুষের বিভক্তি ছিল মি, হুঁ ইত্যাদি। যেমন—

ক. জানমি - আমি জানি।

খ. জানহুঁ - আমরা জানি।

অতীতকালে মধ্যম পুরুষের বিভক্তি ছিল 'স' ও প্রথম পুরুষে 'ই'।

৫. প্রাচীন বাংলায় নাম ধাতুর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

উভিল = ইল প্রভৃতি।

৬. বিভিন্ন ভাবের প্রয়োগে নানা অব্যয়ের ব্যবহারও এই পর্বে দেখা যায়। যেমন—

ক. নঞর্থক অব্যয় — দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই। (ন সংযোজক অব্যয়)

খ. সংযোজক অব্যয় — জো সে বুধী সো নিবুধী। (ই, ঈ, বি সংযোজক অব্যয়)

গ. সম্বোধনসূচক অব্যয় — ডোম্বী বাহলো ডোম্বী। ('লো' সম্বোধনসূচক অব্যয়)

৭. 'ইল' প্রত্যয় যোগে অতীত কালের রূপ গঠন বহুক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলায় দেখা গেছে। আর 'ইব' প্রত্যয় যোগে ভবিষ্যৎ কালের রূপ গঠিত হয়েছে। উদাহরণ—

ক. অতীত কালের রূপ : বেঢ়ল (বেঢ় + ইল) ইত্যাদি।

খ. ভবিষ্যৎ কালের রূপ : করিব, যাইব প্রভৃতি।

৩.১.৪.১.৩ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন বাংলার প্রধান ছন্দ ষোলো মাত্রার পাদাকুলক। মূলত এই ছন্দ থেকেই পরবর্তীকালে পয়ার, ত্রিপদী, মহাপয়ার, দীর্ঘ ত্রিপদী ইত্যাদি ছন্দ জন্মলাভ করেছিল বলে মনে করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় চৌদ্দ মাত্রার এই ছন্দের কথা—

২	২	১১১১	১২১	২	
কা	আ	তরুবর,	পঞ্চবি	ডাল।	৪+৪+৪+২ =১৪
২১১	২২	২২	২		
চঞ্চল	চীএ	পইঠো	কাল।।		৪+৪+৪+২=১৪

এ ছাড়া চর্যাপদে দেখা যায় নানা অলংকার, ধাঁধা ও প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার।

৩.১.৪.২ : আদি-মধ্য বাংলা (Early Middle Bengali)

আদি-মধ্য বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন বড়ু-চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। আর অন্ত্য-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার নমুনা পাওয়া যায় বৈষ্ণব পদাবলী, সমকালীন মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন, অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি কাব্যে। চৈতন্য জীবনীকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত ও ভগবতের অনুবাদ, লোককাব্য, শাক্ত পদাবলী, আরাকানের মুসলমান কবিদের রচনা ইত্যাদি।

৩.১.৪.২.১ : ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. আদি মধ্য বাংলা ভাষায় মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতা লোপ পেয়েছে। অর্থাৎ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরে 'হ' ধ্বনি থাকলে অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছিল।

যেমন — কতহো > কথো ইত্যাদি।

২. এই পর্বে বাংলায় 'আ' কারের পরে অবস্থিত 'ই' ও 'উ' ধ্বনি ক্ষীণ হয়ে যায়।

যেমন — বড়াই > বড়াই প্রভৃতি।

৩. আদি মধ্য বাংলায় প্রথম শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত বর্তমান। যার ফলে, হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়েছিল।

যেমন — আতিশয় (অতিশয়), আন্ধারী (অন্ধকার) ইত্যাদি।

৪. নাসিক্যের সঙ্গে যুক্ত মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন আদি মধ্য বাংলায় লুপ্ত হল।

যেমন— কাহ্ন > কানু, আহ্মি > আমি ইত্যাদি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাহ্নের প্রচলনই বেশি।

৫. স্বরভক্তির ব্যবহার আদি মধ্য বাংলায় বহুল ব্যবহৃত হয়েছিল।

যেমন — বর্ষা > বরিষা, ব্যাকুল > বেআকুল, শক্তি > শকতি ইত্যাদি।

৬. প্রাচীন বাংলার থেকে মধ্য বাংলা স্বরসংগতির ব্যবহার অনেক বেশি।

উদাহরণ - এখনী > এখুনী, ভেড়ি > ভিড়ি প্রভৃতি।

৭. অপিনিহিতির ব্যবহারও এখানে বেশি।

যেমন— আসিহ > আইস ইত্যাদি।

৩.১.৪.২.২ : রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. আদি মধ্য বাংলা ভাষায় বিভিন্ন কারকের বিভক্তি ছিল—

ক. কর্তৃকারকে 'শূন্য' বিভক্তি। উদাহরণ — কাক কাঢ়ে রাত্র।

খ. গৌণ্যকর্ম ও সম্প্রদান কারকে ক, কে, রে বিভক্তির ব্যবহার। যেমন—

তাক না করিহ দয়া।

কংসকে বুলিল কন্যা।

সাপেরে করিআঁ বিষদানে।

গ. করণ কারকে বিভক্তি ছিল ত, এ, এঁ ইত্যাদি। উদাহরণ—

নিজ মাসেঁ হরিণী জগতের বৈরী।

হাথত ধরি আঁ মোর দগধপরাণে

মিছাই মাত্রাএ পাড়এ সান।

ঘ. অধিকরণ কারকের বিভক্তি ছিল ত, তে, এ ইত্যাদি।

বাটত সুজিআঁদা সিসতে সিন্দুর।

বাটে হাটে ঘাটে কাহ্নাঞির দান বটে।

ঙ. কর্মে বিভক্তিহীনতা দেখা যায়। উদাহরণ — কাহ্ন নাব ছোড়ী।

চ. অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত না হয়ে 'হৈতে' অনুসর্গের ব্যবহার ছিল।

যেমন — আজি 'হৈতে' আহ্মারা হৈলাহোঁ' একমতী।

ছ. সম্বন্ধ পদে বিভক্তি ছিল — র, এর, ক, কের ইত্যাদি। যেমন—

ভাঁগিল সোনার ঘট।

যমুনাক ভিতে।

নদীকের বাণে।

২. এখান থেকেই সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণের ব্যবহার শুরু হয়েছে।

৩. এই পর্বের ভাষায় তির্যক কারক অর্থে আন্তর, মাঝেঁ, সমে, পানে, ঠাঁই ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার দেখা যায়।

৪. প্রাচীন বাংলায় ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার উচ্চারণ নেই। কিন্তু আদি মধ্য বাংলায় 'আছ' ধাতুযুক্ত যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার শুরু হয়েছিল।

৫. আদি মধ্য বাংলায় বচন দু'ভাবে হয়েছে। প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে গণ, সব, জন, রা ইত্যাদি যোগ করে এবং অপ্রাণিবাচক শব্দে শুধু গণ যোগ করে। উদাহরণ—

প্রাণিবাচক শব্দ দেবগণ, তোহ্মারা ইত্যাদি।

৬. আদি মধ্য বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে 'আছ' ধাতু যোগ হয়ে যৌগিক ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়।

যেমন—ফুটিলছে > ফুটিল + আছে।

৭. বচনের ব্যবহার খুব বেশি এখানে নেই। শুধু সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে 'রা' বিভক্তি যোগে বহুবচন করা হত। যেমন— আহ্মারা, তোহ্মারা ইত্যাদি।

৮. এই পর্বে লিঙ্গভেদ কেবল প্রাণিবাচক শব্দের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল।

যেমন —কোঁঅলী, পাতলী, বালী প্রভৃতি।

৯. অসমাপিকা ক্রিয়াপদে অনুসর্গ হিসেবে 'গিয়া' সিয়া' ব্যবহৃত হয়।

যেমন— দেখ গিয়া ইত্যাদি।

১০. আদি মধ্য বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে উত্তম পুরুষে অজ্ঞাতকালে 'লোঁ, 'ইল', বর্তমানকালে ও', ই এবং ভবিষ্যৎ কালে 'ইব' যোগ করা হয়েছে।

যেমন—আনিলোঁ, ছাড়িলাঁ, আরতিল ইত্যাদি। (অতীত কাল)

নিশিবোঁ, ছাড়িবোঁ প্রভৃতি। (ভবিষ্যৎ কাল)

১১. প্রাচীন বাংলা ভাষায় অপভ্রংশের ক্রিয়াবিভক্তি লুপ্ত বা বিবর্তনের ফলে পালটে গেলেও আদি মধ্য বাংলায় এর রূপগুলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে ধরা পড়েছে। যেমন—

প্রাচীন বাংলা— 'ই' (প্রথম পুরুষ) > আদি মধ্য বাংলা — 'ই', 'এ'

১২. নামধাতুর ব্যবহারও আদি মধ্য বাংলায় আছে।

৩.১.৪.২.৩ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

পয়ার ছন্দের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা আদি মধ্য-বাংলাতেই হয়েছিল। ষোলো মাত্রার পাদাকুলক ছন্দ থেকে চৌদ্দো মাত্রার অক্ষর বিশিষ্ট পয়ার ছন্দের উৎপত্তি ও পরিণতি এই পর্বেই ঘটেছিল। এ ছাড়া নানারকম ত্রিপদী, চৌপদী একাবলী

ইত্যাদি ছন্দের ব্যবহারও আদি মধ্য বাংলায় দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর এই দুটি লাইনে—

২	১১	১১	১১	১১	১১১১	
তোর	রতি	আশো	আঁশে/	গেলা	অভিসারে।	(৮+৬)
১২	১২	২	১১	১১১১		
সকল	শরীর	বেশ/করী	মনোহরে।			(৮+৬)

৩.১.৪.৩ : অন্ত্য-মধ্য বাংলা (Late Middle Bengali)

এই যুগের বাংলা ভাষার বহু নিদর্শন রয়েছে। সে কথা আদিমধ্য যুগের বাংলা ভাষার সূচনায় তা লেখা হয়েছে। তবে বলা যায় এই যুগের বাংলা ভাষার নিদর্শনগুলিই যোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাংলা সাহিত্যে সুবর্ণযুগের সূচনা করেছিল।

৩.১.৪.৩.১ : ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. অভিশ্রুতির ব্যবহারও অন্ত্য-মধ্য বাংলায় পাওয়া যায়।

যেমন— খাইয়া > খায়া > খায়্যা, খেয়ে, বানিয়া > বাইন্যা > বেনে প্রভৃতি।

২. আধুনিক বাংলা ভাষায় 'অ' কার 'ও' কারে রূপান্তরিত হয়েছে। অন্ত্য মধ্য বাংলায়ও তা দেখা যায়। যেমন— ভালো, বারোমাস্যা ইত্যাদি।

৩. অন্ত্য-মধ্য বাংলায় নাসিক্যধ্বনির মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয়েছিল। তবে অনুনাসিক ধ্বনি লুপ্ত না হয়ে বর্তমান ছিল।

উদাহরণ—কাহ্নু > কানু (নাসিক্য ধ্বনি)

শিশু কান্দে ওদনের তরে। (অনুনাসিক ধ্বনি)

৪. উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্বরের সংকোচ ও আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ার জন্যে মধ্যস্বর লোপের দৃষ্টান্তও অন্ত্য-মধ্য বাংলায় দেখা যায়।

যেমন —স্বর সংকোচন : আইনু > আনু ('ই' স্বর সংকোচন)

মধ্য স্বরলোপ : রান্ধিবে মুসরি ডাল।

মুসুরি > মুসরি (মধ্যস্বর 'উ' লোপ)

৫. বর্ণবিপর্যয় ও বিষমীভবনের উপস্থিতিও এই পর্বে দেখা যায়। উদাহরণ—

বর্ণবিপর্যয় : মনসার হটে তার সাত ডিঙ্গা বুড়ে

এখানে 'ডুবে' বর্ণবিপর্যয়ের ফলে 'বুড়ে' হয়েছে।

বিষমীভবন : নয়ন > নঅন > নঞান

৬. 'অ্যা' ধ্বনির উদ্ভব হয়েছে এই পর্বে।

যেমন — গোধিক্যা রাখ্যাছি বান্ধি।

৭. এখানে অর্ধ তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

যেমন — ক্ষমা > খেমে ইত্যাদি।

৩.১.৪.৩.২ : রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. সংখ্যাবাচক শব্দ, বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয়, বহুত্ববোধক শব্দ ও পদ যোগে বহুবচনের রূপ গঠন করা হত। যেমন—

সংখ্যাবাচক শব্দ : সপ্ত, অষ্ট ইত্যাদি।

বহুত্ববাচক শব্দ : ব্যাস আদি যত কবি।

বহুত্ববাচক শব্দ : বহু পশুগণ ইত্যাদি।

২. এই পর্বের বাংলায় 'আছ' ধাতু যোগ করে যৌগিক কালের রূপ গঠন করা হত।

যেমন—

আন্যাছি = আন্ + আছ্ + ই

করয়াছ = কর + আছ্

৩. অন্ত্য-মধ্য বাংলায় উত্তম পুরুষের পাঁও, রাঁও, জাঁও ইত্যাদির রূপ ছিল। যেমন—

ক. তোর যদি লাগ পাঁও।।

খ. পাঁও আমি পাই।

৪. এই পর্বে অতীত কাল বোঝাতে 'ইল' ও ভবিষ্যৎ কাল বোঝাতে 'ইব' ব্যবহৃত হত। যেমন—

ক. করিল = কর + ইল

খ. না থাকিব তোমার ঘরে।

থাকিব = থাক + ইব প্রভৃতি

৫. এই পর্বের বাংলা ভাষায় নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টির জন্য অনেক অর্থহীন শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। যেমন—

বনমধ্যে একেশ্বরী সঙ্গে কেহ নাই।

একেশ্বর = (এক + ঈশ্বর)

এখানে 'ঈশ্বর' শব্দটি অর্থহীন। কারণ এটি শব্দালংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. বিশেষ্যকে জোর দেওয়ার প্রয়োজন বিশেষ্যের আগে 'অ' উপসর্গের ব্যবহার এখানে দেখা যায়। যেমন—

অকুমারী = অ + কুমারী

৩.১.৪.৩.৩ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

সর্বত্রই পয়ার ছন্দের ব্যবহার এই পর্বের বাংলা ভাষায় দেখা যায়। যেমন—

১১ ১১ ১১১১ ১১১ ১১১

দেখ দ্বিজ মনসিজ। জিনিয়া মূরতি। ৮ + ৬ = ১৪

১১১১ ১১১১ ১১১১ ১১

পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র। পরশয়ে শ্রুতি। ৮ + ৬ =১৪

এ ছাড়া বিভিন্ন রকম ত্রিপদী, মাত্রাবৃত্ত ও শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের ব্যবহারও বেড়ে গেল। অন্ত্য-মধ্য বাংলায় একটি নতুন ছন্দেরও আবির্ভাব হয়। সেটি হল বৈষ্ণব কবিতায় অপভ্রংশের চতুষ্পদী ব্যবহার।

৩.১.৪.৪ : আধুনিক বাংলা (Modern Bengali)

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু সালটিকে মধ্য বাংলার সমাপ্তি হিসেবে ধরা হয়। এরপর থেকেই শুরু হয় আধুনিক যুগ। কেউ কেউ আবার ১৮০০ খ্রিস্টাব্দকে মধ্যযুগের সমাপ্তি বলে মনে করেন। সেই হিসেবে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আধুনিক বাংলা ভাষার কালসীমা ধরা হয়।

আধুনিক বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের লেখা গদ্যসাহিত্য, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, যতীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখর কাব্য-কবিতা, বিভিন্ন লেখকের নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদিতে। বলা যায় বর্তমান সময়ের সব রচনার মধ্যেই আধুনিক বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলার জীবন্ত নিদর্শন মানুষের মুখের ভাষা। এখানে আধুনিক বাংলা ভাষার কয়েকটি বিশেষ ভাষা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন — পৃথিবীর সব উন্নত ভাষার মতো আধুনিক বাংলা ভাষারও দুটি রূপ দেখা যায়। যথা-লেখ্যরূপ ও কথ্যরূপ। বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত গদ্যভাষা আধুনিক বাংলায় ব্যবহৃত হতে লাগলো। অর্থাৎ গদ্য সাহিত্যের সূচনা হল আধুনিক বাংলাতেই। তবে এই গদ্য মূলত সাধু গদ্য। অবশ্য বর্তমানে শিষ্ট চলিত গদ্যই ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩.১.৪.৪.১ : ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. আধুনিক বাংলা ভাষায় অপিনিহিতির বহুল ব্যবহারের পাশাপাশি অভিশ্রুতির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন—

রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে

মরিয়া > মইর‍্যা > মরে ইত্যাদি।

২. এই পর্বের বাংলায় বর্ণদ্বিতের ব্যবহার দেখা গেছে। যেমন—

ছোট > ছোট্ট

সকলে > সক্কলে প্রভৃতি।

৩. আধুনিক বাংলা ভাষায় তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে পদের মধ্যে অবস্থিত ঢ় > ড় হল এবং পদের শেষে অবস্থিত 'হ' কারের লোপ ঘটল। উদাহরণ—

বঢ়াই > বাঢ়ে > বাড়ে (ঢ় > ড় হল)

তাহার > তার (হ কার লোপ)

৪. এই পর্বের বাংলা ভাষায় স্বরসঙ্গতি ও সমীকরণের বাহুল্য দেখা গেল। উদাহরণ—

স্বরসঙ্গতি : কুড়াল > কুড়ুল, রূপা > রূপো, জন্য > জন্যে প্রভৃতি।

সমীভবন : পদ্ম > পদ্দ, ধর্ম > ধম্ম ইত্যাদি।

৫. ধ্বনির আগম ও ধ্বনিলোপ দুই-ই আধুনিক বাংলা ভাষায় দেখা যায়। যেমন—

ধ্বনির আগম : স্কুল > ইস্কুল প্রভৃতি।

ধ্বনিলোক : ভগিনী > ভগ্নি ইত্যাদি।

৬. আধুনিক বাংলায় সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি দ্বিস্বর ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন—

আইল > এলো, গাইল > গেলো ইত্যাদি।

৭. বর্ণ বিপর্যয়ের উদাহরণ পাওয়া যায় আধুনিক বাংলা ভাষায়। উদাহরণ—

বারাণসী > বেণারসী

বাক্স > বাস্ক ইত্যাদি।

৮. শব্দার্থের নানা পরিবর্তন যেমন — অর্থের অবনতি, অর্থের উন্নতি, অর্থের সংকোচ, অর্থের বিস্তার ও অর্থের সংশ্লেষ আধুনিক বাংলায় দেখা যায়। যেমন—

মূল শব্দ	আদি অর্থ	সংকুচিত অর্থ
ক. নাগর	নগরের বিদগ্ধ ব্যক্তি	অবৈধ প্রণয়ী
	আদি অর্থ	প্রসারিত অর্থ
খ. গাঙ	গঙ্গা নদী	যে কোনও নদী।

৯. আধুনিক বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সাধুভাষার ক্ষেত্রে ক্রিয়া, সর্বনাম, বিশেষ্য ও অনুসর্গের ব্যবহার দেখা গেলেও চলিত ভাষায় এগুলির সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

		সাধু		চলিত
ক্রিয়া	:	করিব	>	করব
বিশেষ্য	:	জলিয়া	>	জেলে
বিশেষণ	:	তাহা	>	তার
অনুসর্গ	:	হইতে	>	হতে, থেকে

১০. আধুনিক বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সাধুভাষায় অনুনাসিকের সঠিক প্রয়োগ দেখা যায়।

উদাহরণ — বংশী > বাঁশি, পঞ্চ > পাঁচ ইত্যাদি।

১১. দ্বিমাত্রিকতার প্রভাব এই পর্বে লক্ষণীয়।

যেমন — জানালা > জানলা, গামোছা > গামছা প্রভৃতি।

৩.১.৪.৪.২ : রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. আধুনিক বাংলা ভাষায় নামধাতুর বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

২. এই পর্বের ভাষায় বিভিন্ন কারকের ক্ষেত্রে সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়।

ক. কর্তৃকারক : পাখিতে ফল খেয়েছে।

খ. করণকারক : এ তুলিতে আঁকা যায় না।

গ. অপাদান কারক : বিনা মেঘে বজ্রপাত।

ঘ. অধিকরণ কারক : জলে থাকে মাছ।

৩. আধুনিক বাংলায় সংযোগক অব্যয় হিসেবে 'এবং', 'ও'-এর বহুল ব্যবহার দেখা গেল।

যেমন— ক. সমরবাবু মতিগঞ্জের বাড়িতে গেলেন এবং তিনি খেতে বসলেন।

(এখানে 'এবং' সংযোজক অব্যয় দুটি বাক্যকে জুড়ে দিয়েছে।)

খ. অনুরিমা ও দেবাংশী ভাইয়াদার বাড়িতে গেল।

(এখানে 'ও' সংযোজক অব্যয় দুটি নামবাচক শব্দ অনুরিমা ও দেবাংশীকে জুড়ে দিয়েছে।)

বর্তমানে 'ও', 'এবং'-এর জায়গায় 'আর' সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার শুরু হয়েছে। যেমন— শাঁওলি ও শুভশ্রী ভুবনেশ্বরে গেল।

৪. এই পর্বে সংযোজক অব্যয় ছাড়াও বাক্যালঙ্কার অব্যয়েরও ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণ —

ক. অনুপমের কথা তো আমি বলতে পারব না।

খ. আমি তো আজ পেয়ারা খাইনি।

৫. আধুনিক বাংলার সাধু ভাষার ক্ষেত্রে যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায়।

যেমন — ধ্যান করা, পান করা, খেলা করা ইত্যাদি।

৬. এই পর্বে সমাপিকা ক্রিয়ার পরে ও অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে 'না' বাচক শব্দটি ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণ—

সমাপিকা ক্রিয়া : যেও না।

অসমাপিকা ক্রিয়া : না বুঝে, না জেনে প্রভৃতি।

৭. আধুনিক বাংলায় ক্রিয়ার কাল তিনটি। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। ক্রিয়ার ভাব দুটি — নির্দেশক ও অনুজ্ঞা। তবে কাল ও ভাব বৈচিত্র্যময়। আধুনিক বাংলা ভাষাতেই 'ইয়া' যুক্ত অসমাপিকার জায়গায় 'পূর্বক' শব্দটি ব্যবহার করে অসমাপিকার ভাব বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন —

দর্শন ক্রিয়া > দর্শন পূর্বক

অনুগ্রহ করিয়া > অনুগ্রহ পূর্বক ইত্যাদি।

৩.১.৪.৪.৩ : বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য

১. আধুনিক বাংলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটিমাত্র সরল বাক্যে পরিণত করার রীতি প্রচলিত। যেমন—

ক. সে খেল না। সে চলে গেল। (সমাপিকা ক্রিয়া)

খ. সে না খেয়ে চলে গেল। (অসমাপিকা ক্রিয়া)

২. মধ্য বাংলা ভাষার নঞর্থক বাক্য বোঝাতে 'না' শব্দটি ক্রিয়াপদের আগে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। কিন্তু আধুনিক বাংলায় 'না' শব্দটি ক্রিয়াপদের পরে বসতে শুরু করেছে।

যেমন — সে এল না। রাম বসল না।

৩. আধুনিক বাংলা ভাষার বাক্যে অস্তিত্ববাচক ক্রিয়ার রূপটি বেশিরভাগ সময়ে উহ্য থাকে। যেমন—

ক. সত্যজিৎ ভারতের মহান চলচ্চিত্র পরিচালক।

খ. বাংলা কাব্য সাহিত্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব।

উপরের দুটি বাক্যে (হওয়া) অস্তিত্ববাচক ক্রিয়ার রূপটি উহ্য রয়েছে।

অর্থাৎ সত্যজিৎ হন/হলেন অথবা শক্তি চট্টোপাধ্যায় হন/হলেন।

৪. ইংরাজির মতো বাংলা বাক্যে বিশেষ্যর আগে বিশেষণ বসে।

যেমন — দারুন বাড়ি, অসাধারণ ছেলে, ভালো মেয়ে ইত্যাদি। কিন্তু বিশেষ ভাব প্রকাশের সময় বিশেষ্যর পরে বিশেষণ বসে।

যেমন— মেয়ে ভালো, ছেলে অসাধারণ ইত্যাদি।

৫. আধুনিক বাংলায় বাক্যস্থিত পদের ক্রম, কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া। কিন্তু ভাব প্রকাশের নিরিখে এই ক্রম সবসময় থাকে না। আধুনিক বাংলায় ছোট ছোট বাক্যের ব্যবহার হচ্ছে। ক্রিয়াকে যথাসম্ভব তুলে দিয়ে বাক্য সপ্রতিভ করা এখনকার লেখকদের উদ্দেশ্য। আর বাক্যে কমা, সেমিকোলন, কোলন ইত্যাদি কমিয়ে দাঁড়ির ব্যবহার বেশি হয়েছে।

৩.১.৪.৪.৪ : শব্দগ্রহণগত বৈশিষ্ট্য

১. আধুনিক বাংলা ভাষায় ইংরেজি, পর্তুগিজ ইত্যাদির শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। এ ছাড়া বহু বিদেশি উপসর্গও আধুনিক বাংলায় এসেছে। যেমন—

ক. ইংরেজি শব্দ : চেয়ার, ব্যাঙ্ক, স্কুল ইত্যাদি।

খ. পর্তুগিজ শব্দ : আলমারি, আনারস, সাবান, কেরোসিন প্রভতি।

গ. ফারসি শব্দ : বাজার, খরচ, বাগান ইত্যাদি।

ঘ. বিদেশি উপসর্গ শব্দ : ফি-বছর ('ফি' উপসর্গ) ফুলমোজা ('ফুল' উপসর্গ) প্রভৃতি।

ঙ. অনেক ইংরেজি শব্দ দেশজ রীতিতে নতুন রূপ পেয়েছে। যেমন— Lord > লাট, Lantern > লণ্ঠন ইত্যাদি। অনেক শব্দের পরিভাষা করা হয়েছে। যেমন College > মহাবিদ্যালয়, Wrist watch > হাতঘড়ি ইত্যাদি।

৩.১.৪.৪.৫ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

পয়ার, ত্রিপদী, অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ইত্যাদি ছন্দের ব্যবহার ব্যাপকভাবে এসেছে। এই বাংলায় আধুনিক বাংলায় গদ্যছন্দের সূচনা বিস্ময়কর। পুরনো পয়ার, ত্রিপদী ভেঙে গৈরিশ ছন্দের উদ্ভব তো হলই, পাশাপাশি দেখা গেল গদ্যছন্দের বহুল ব্যবহার। 'ভারততীর্থ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

১	১১	১১১	১১	১২	১২	১	১২	
এ	কথা	জানিতে	তুমি/	ভারত	ঈশ্বর	শা-	জাহান	৮ + ১০

১১১১১১২ ১২১২১১২

কালস্রোতে ভেসে যায়/জীবন যৌবন ধনমান ৮ + ১০

৩. ১. ৪. ৫ : অত্যাধুনিক বাংলা (Ultra Modern Bengali) :

মানুষ নিজের অজান্তে ভাষার পরিবর্তন করে ফেলে। পরিবর্তন কিন্তু একদিনে সম্ভব নয়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন গত বিশ বছরে এই পরিবর্তন অস্বাভাবিক ভাবে হয়েছে। বাংলা ভাষার এই পরিবর্তনকে সামনে রেখে আমরা একটা নাম দিতে পারি এই পর্বের। সেটা হল অত্যাধুনিক বাংলা। এই বাংলা ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত, বাক্যগঠনগত ও ছন্দোগত পরিবর্তনগুলি আলোচনা করা হল।

৩. ১. ৪. ৫. ১ : ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. এই বাংলায় স্বরসঙ্গতি ছাড়াও ব্যঞ্জনধ্বনির কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয়।
যেমন — বাড়িওয়ালা > বাড়িঅলা, ফেরিওয়ালা > ফেরিঅলা ইত্যাদি।

২. শব্দদ্বৈতের মাধ্যমে নিত্য নতুন শব্দ তৈরি করে তা বাক্যে ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। যেমন—

ক. দিন দিন যা শুরু হয়েছে।

খ. রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।

৩. কম্পিউটার প্রযুক্তি আসার ফলে ছাপার অক্ষরে স্পষ্ট রূপ, কখনও যুক্ত ব্যঞ্জনগুলি স্বচ্ছ হয়েছে।

৪. তৎসম শব্দ ছাড়া প্রায় সব শব্দেই 'ঈ'-কারের বদলে 'ই'কার, মূর্ধন্য (ণ)-এর পরিবর্তে দন্তন্য (ন), 'ষ'-এর পরিবর্তে 'শ' বা 'স' -এর ব্যবহার লক্ষণীয়।

যেমন — ট্রেণ > ট্রেন, বাড়ী > বাড়ি, মাষ্টার > মাস্টার ইত্যাদি।

৫. খণ্ড-ৎ-এর ব্যবহারও একদম তলানিতে ঠেকেছে। যেমন—

কদাচিৎ > কদাচিত, উচিৎ > উচিত প্রভৃতি।

৬. অসমীভবন প্রক্রিয়ায় সমব্যঞ্জনার লোপ এই পর্বে ঘটে চলেছে। যেমন—

অভিভাবক > অবিভাবক, পৌঁছেছে > পৌঁচেছে ইত্যাদি।

৩. ১. ৪. ৫ . ২ : রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. খণ্ডিত শব্দের ব্যবহার এই পর্বে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন— মাইক্রোফোন > মাইক, ইউনিভারশিটি > ভারসিটি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন > অ্যাডমিন > অ্যাডাম ইত্যাদি।

২. এই পর্বে ইংরাজি-বাংলা শব্দ দিয়ে যৌগিক পদ তৈরি করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে এগুলি কিন্তু যৌগিক ক্রিয়াপদ নয়। যেমন— তদন্ত কমিশন, প্যাকেজ নাটক, গোলটেবিল বৈঠক প্রভৃতি।

৩. ইংরাজি সহ বিভিন্ন ভাষা থেকে অসংখ্য শব্দ তো এই ভাষাতে আসছেই, তবুও নিত্যনতুন শব্দ তৈরি হচ্ছে। যেমন —

বিন্দাস, ফান্ডা, মালটিন্যাশনাল, ওয়ান স্টপ প্রভৃতি।

৪. বিশেষ্যের সংক্ষিপ্তকরণ করা এই পর্বের বাংলার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যেমন—

আনন্দবাজার পত্রিকা > এবিপি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় > ক.বি, ইন্দিরা গান্ধি ওপেন ইউনিভার্সিটি > ইগনু ইত্যাদি।

৫. বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে কিছু বিদেশি শব্দ যুক্ত করে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। যেমন— চেক করা, ট্যাকস দেওয়া, বুক করা প্রভৃতি।

৩. ১. ৪. ৫. ৩ : ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য

অত্যাধুনিক বাংলা ভাষার ছন্দ আগের চেয়ে অনেক স্বচ্ছন্দ হয়েছে। সব ছন্দকে বাইরে ফেলে গদ্য ছন্দ একচ্ছত্র রূপ নিয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মারা যাবার পর জয় গোস্বামী লিখেছেন—

'বিরোধিতা করলাম অনেক।
তোমার সুস্পষ্ট বিরোধিতা
আজও, তোমার মরদেহের সামনে দাঁড়িয়ে

মনে হয় ভুল-ই করেছি। ....

(২৫ অক্টোবর, ২০১২ : জয় গোস্বামী)

অত্যাধুনিক বাংলার ছন্দ যে কথা বলে তা সুনীল কবিতাতেও স্পষ্ট।

নির্ভেজাল বাংলা গদ্য ছন্দের কবিতা—

‘ হে প্রথম লাইন, এসো, খাতা ও কলম নিয়ে
বসে আছি, এসো
আকাশে রঙিন মেঘ, বজ্রগর্ভ, বিদ্যুতের এক
ঝটিকার মতন, এসো’,

(হে প্রথম লাইন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

৩. ১.২. ২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ
২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত
৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা
৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)
৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)
৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ
৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : ‘বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।’

৩. ১.২. ৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. প্রাচীন বাংলা ভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।
২. আদি-মধ্য-বাংলা ভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।
৩. অন্ত্য-মধ্য-বাংলা ভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।
৪. আধুনিক বাংলা ভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা।

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ৫

বাগযন্ত্র

বিন্যাস ক্রম :

৩.১.৫.১ : বাগযন্ত্র

৩.১.৫.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.১.৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.১.৫.১ : বাগযন্ত্র

ভাষা হল মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ ধ্বনির সমষ্টি। মানব শরীরের যে সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধ্বনি উচ্চারণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে সেগুলিকে একত্রে বাগ্‌যন্ত্র বলে। বাগ্‌যন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশগুলি হল - ঠোঁট, দাঁত, জিভ প্রভৃতি। অনেকে ফুসফুসকে বাগযন্ত্রের মধ্যে ধরেন না। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানী নোয়েল আর্মফিল্ড ফুসফুসকে বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যেই ধরার পরামর্শ দিয়েছেন। সাধারণত দেখা যায় বাগ্‌যন্ত্রের মাধ্যমে উচ্চারিত ধ্বনিতে স্বরযন্ত্র, স্বরতন্ত্রী, জিহ্বা, ওষ্ঠ প্রভৃতি সক্রিয়ভাবে এবং নাসিকা, দন্ত, তালু প্রভৃতি নিষ্ক্রিয়ভাবে সহায়তা করে।

নিশ্বাস-বায়ু ফুসফুস থেকে নির্গত হয়ে শ্বাসনালী দিয়ে কন্ঠের মধ্য দিয়ে মুখগহ্বরে ও নাসাগহ্বরে প্রবেশ করে। শ্বাসনালীর ঠিক মধ্যে আছে স্বরযন্ত্র। ওই স্বরযন্ত্রেই সর্বপ্রথম নিশ্বাস বায়ু বাধার সম্মুখীন হতে পারে। এখানে আছে একজোড়া স্বরতন্ত্রী। স্বরতন্ত্রীতে থাকে দুটি পাতলা অথচ মজবুত স্থিতিস্থাপক ঝিল্লি। যার সামনের দিকটা বাক্সের ডালার মতো জোড়া লাগানো। পিছনের দিকটা খোলা ফলে শ্বাসবায়ু বিনা বাধায় বাইরে আসতে পারে। কিন্তু কোনও ধ্বনি উচ্চারণের চেষ্টা হলেই বায়ুর সংঘর্ষে তন্ত্রীতে দেখা যায় কম্পন — আর ওই কম্পন তরঙ্গের মাধ্যমেই বিচিত্র ধ্বনির সৃষ্টি হয়। উৎপন্ন ধ্বনিতে ঘোষ বা নাদ যুক্ত হলে হয় সঘোষ ধ্বনি এবং ঘোষ বা নাদ যুক্ত না হলে হয় অঘোষ ধ্বনি। স্বরতন্ত্রীর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং কম্পন ক্ষমতার তারতম্যের উপর 'স্বরের গ্রাম' নির্ভর করে। নারীর তুলনায় সাবালক পুরুষের স্বরতন্ত্রীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বেশি, তাই পুরুষের কণ্ঠস্বর মোটা। স্বরতন্ত্রের উপরে একটি মাংস খণ্ড আছে, যাকে বলা হয় উপজিহ্বা। শ্বাসনালীর পাশেই খাদ্যনালী। খাবার সময় উপজিহ্বা

> *ভাষা হল মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ ধ্বনির সমষ্টি। মানব শরীরের যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি উচ্চারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে সেগুলিকে বাগ্‌যন্ত্র বলে। বাগ্‌যন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশগুলি হল — ঠোঁট, দাঁত, জিভ প্রভৃতি।*

শ্বাসনালীর পথ রুদ্ধ করে দেয়, না হলে খাবার ওখানে ঢুকে পড়ে বিষম লাগাত। ওদিকে শ্বাসবায়ু মুখগহ্বরের প্রবেশ পথে উপরের দিকে ঝোলে আলজিভ। এটা নাসা গহবরে যাবার পথ আটকে দিলে বায়ু শুধুই মুখগহ্বরে প্রবেশ করে। মুখগহ্বরের মধ্যে নীচের বাগযন্ত্র হল জিহ্বা। কণ্ঠনালীর স্থান থেকে জিহ্বার মূল শুরু। জিহ্বা কয়েকটি অংশে বিভক্ত - জিহ্বাপ্রান্ত, জিহ্বাফলক, সম্মুখ জিহ্বা, পশ্চাৎ জিহ্বা, জিহ্বামূল। আলজিহ্বার সামনেই থাকে নরম তালু, তার সামনে যথাক্রমে মূর্ধা, শক্ত তালু এবং দন্তমূল। এর পরেই থাকে দন্ত, যার পিছনে জিহ্বাগ্র ধ্বনি সৃষ্টি করে। মুখগহ্বরের বাইরে বাগ্‌যন্ত্রের যে অংশ দুটি আছে তার নাম অধর ও ওষ্ঠ। স্বরতন্ত্রীতে কম্পন জাগিয়ে শ্বাসবায়ু বাইরে আসবার দুটি পথ পায়। একটি মুখবিবর এবং অপরটি নাসাবিবর। নাসাগহ্বরের মধ্যে বায়ু অনুরণিত হয়ে নাসারন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে গেলে অনুনাসিক (Nasal) ধ্বনি উচ্চারিত হয়। মুখগহ্বর দিয়ে নির্গত ধ্বনি হল অননুনাসিক (Non-Nasal) ধ্বনি।

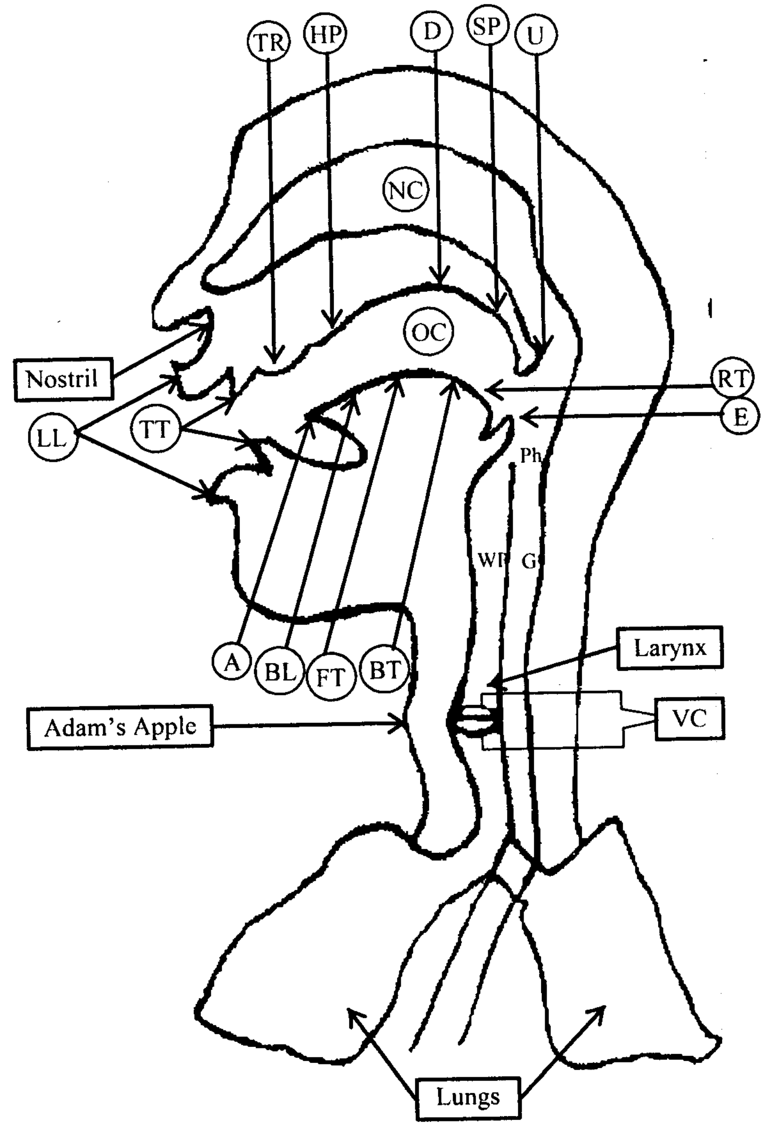

বাগযন্ত্রের চিত্রের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি :

NC = Nasal Cavity = নাসিকা গহ্বর

OC = Oral Cavity = মুখগহ্বর

LL = Lips = ওষ্ঠ ও অধর

TT = Teeth = দন্ত

TR = Teeth Ridge = Alveolar দন্তমূল

HP = Hard Palate = শক্ত তালু

D = Dome = সবোদ তালু বা মূর্ধা

SP = Soft Palate = নরম তালু

U = Uvola = আলজিভ

A = Apex = Tip of the Tongue = জিহ্বাপ্রান্ত

BL = Blade of the Tongue = Lamina = জিহ্বামূল

FT = Front of the Tongue = জিহ্বার সামনের ভাগ

BT = Back of the Tongue = জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ

Ph = Pharynx = কণ্ঠনালী, গলবিল

WP = Wind Pipe = শ্বাসনালী

Larynx = স্বরযন্ত্র

Nastril = নাসারন্ধ্র

Adams Apple = আদমের আপেল (?)

Lungs = ফুসফুস

E = Epiglottis = উপজিহ্বা

VC = Vocal Chords = স্বরতন্ত্রী

RT = Root of the Tongue = জিহ্বামূল

৩.১.৫.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে'

৩.১.৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ভাষা কাকে বলে ?

২। বাগ্‌যন্ত্র কাকে বলে ? বাগ্‌যন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ কোনগুলি ? রেখাচিত্রসহ সেগুলির বিবরণ দাও।

পর্যায় গ্রন্থ-২

একক -৬
ভাষাবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ
(ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব)

বিন্যাস ক্রম :

৩.২.৬.১ : ভাষাবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ

৩.২.৬.১.১ : ধ্বনিতত্ত্ব

৩.২.৬.১.২ : রূপতত্ত্ব

৩.২.৬.১.৩ : কাব্যতত্ত্ব

৩.২.৬.১.৪ : শব্দথতত্ত্ব

৩.২.৬.২ : সয়াহক গ্রন্থাবলী

৩.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.২.৬.১ : ভাষাবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ

ভাষাশাস্ত্রের আলোচনা ক্রমশ বিস্তৃত হতে হতে বর্তমানে অনেকগুলি শাখা উপশাখাতে বিন্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভাষাবিজ্ঞানের মূল বিভাগগুলি হল ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও শব্দার্থতত্ত্ব।

৩.২.৬.১.১ : ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

শব্দের বিশ্লেষণে পাওয়া যায় ধ্বনি। ধ্বনি নিয়ে আলোচনা হয় ভাষাবিজ্ঞানের যে অংশে, মোটামুটিভাবে তাকেই বলে ধ্বনিতত্ত্ব। ধ্বনি বা Sound বলতে আমরা যা বুঝি ভাষাবিজ্ঞানের ধ্বনি বলতে ঠিক ঠিক তা বোঝায় না। পাখির ডাক থেকে শুরু করে ইট-কাঠের শব্দ সবকিছুকেই আমরা ব্যাপক অর্থে ধ্বনি বলি। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Sound. কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় শুধুমাত্র মানুষের বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত ধ্বনি। ইংরেজিতে যাকে বলে Phone. তাই এই বাগধ্বনি বা Phone কে নিয়ে গড়ে ওঠা ভাষাবিজ্ঞানের একটি বিভাগ হল ধ্বনিতত্ত্ব বা Phonology. ধ্বনিতত্ত্বের আবার দুটি আলোচ্য বিষয় হল— (ক) ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics) এবং (খ) ধ্বনিবিচার (Phonemics)। মানুষের বাগযন্ত্রের গঠন ও ধ্বনির উচ্চারণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনায় ধ্বনিবিজ্ঞান অংশের মধ্যে পড়ে। উচ্চারিত ধ্বনি বায়ুর মাধ্যমে বাহিত হয়ে শ্রোতার কানে পৌঁছায় ও বোধের সৃষ্টি করে। এই সংক্রান্ত আলোচনাও ধ্বনিবিজ্ঞানের অন্তর্গত। আর ভাষায় ব্যবহৃত মূলধ্বনিগুলির নানা উচ্চারণ বৈচিত্র্য ও যথাযথ ব্যবহারিক বিচার-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত আলোচনায় ধ্বনিবিচারের অন্তর্গত।

৩.২.৬.১.২ : রূপতত্ত্ব (Morphology)

শব্দ বা পদ নিয়ে গঠিত হয় বাক্য। আবার শব্দও গঠিত হয় মূলরূপ বা রূপিম নিয়ে, যেটা এক বা একাধিক ধ্বনি সমবায়ে গঠিত। কোনও শব্দ বা ধাতু কোনও কোনও রূপিম বা মূলরূপ দিয়ে কীভাবে গঠিত হয়েছে তা রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। শব্দ বা ধাতুর মূল অংশের সঙ্গে শব্দ বিভক্তি, ধাতু বিভক্তি, প্রত্যয় প্রভৃতি যোগ হয় এবং এগুলি যুক্ত হওয়ার পরে তার কেমন রূপ দাঁড়ায়— এগুলি রূপতত্ত্বের আলোচনার মধ্যে পড়ে।

৩.২.৬.১.৩ : বাক্যতত্ত্ব (Syntax)

একাধিক ধ্বনি নিয়ে গঠিত হয় শব্দ। আবার একাধিক শব্দ নিয়ে গঠিত হয় বাক্য। যে কোনও ভাষার সবচেয়ে বড় একক বাক্য। যে কোনও ভাষার মূল ভিত্তি বাক্য। সামাজিক মানুষ বাক্যের মাধ্যমে মনে ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু বাক্যে থাকে বিভিন্ন ধরনের পদ। যেমন— বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ইত্যাদি। কীভাবে পদগুলি সাজালে বাক্যটি অর্থবোধক হবে, কীভাবেই বা তা সহজ সরলভাবে শ্রোতার কাছে ধরা পড়বে এর নিয়মনীতি বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে (পদবিন্যাস) কিছু সূত্রের অবতারণা করেছেন। যা বাংলা বাক্যে 'পদক্রম রীতি' নামে পরিচিত। পদবিন্যাসকে যথাযথভাবে না মেনে কথা বললে তার অর্থ বোঝা যায় না। বাক্যতত্ত্বে সাধারণত উদ্দেশ্য-বিধেয়, বিষয়, উক্তিভেদ, পদক্রম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বাক্যতত্ত্বের তিনটি ধারা। প্রথাগত, গঠনমূলক ও রূপান্তরমূলক।

ক. প্রথাগত : এই ধরনের ব্যাকরণে গতানুগতিক ধারা আলোচিত হয়।

খ. গঠনমূলক : এই পর্বে রূপিমের পারস্পরিক সন্নিবেশজনিত গঠনগত বাক্যের স্বরূপ আলোচনা করা হয়।

গ. রূপান্তরমূলক : এই পর্বে গণিত, দর্শন ও মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে বাক্যগত কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়। চমস্কিই রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল পদ্ধতি প্রয়োগ করে বাক্যের বিশ্লেষণ করেছেন।

৩.২.৬.১.৪ : শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)

ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় কোনও শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা হয়, তার প্রতিক্রিয়াকে বলে শব্দার্থতত্ত্ব। এর আলোচনার পিছনে আছে কোনও শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ইতিহাস। শব্দের অর্থ কেন কালে কালে পরিবর্তিত হয়ে যায়, এর দৃষ্টিভঙ্গি কীরকম, কোন কোন ধারায় শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে এই পর্বে সেইসব আলোচনা করা হয়। দার্শনিকরা মনে করেন অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে শব্দার্থের রহস্য। শব্দ ব্রহ্ম। শব্দ ব্রহ্মের মতোই নির্গুণ। শব্দমাত্রই অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টি। অভিধার মাধ্যমে কোনও শব্দের মুখ্য অর্থ এবং লক্ষণার মাধ্যমে কোনও শব্দের গৌণ অর্থ ধরা পড়ে। এই দুটি শক্তি ছাড়াও আছে ব্যঞ্জনা। এর মাধ্যমেই শব্দার্থের চির নতুন অর্থ পাঠকের কাছে ধরা পড়ে।

প্রত্যেকটি শব্দেরই একটা নির্দিষ্ট অর্থ থাকে। পঞ্চমুখী ধারার সাহায্যে সেইসব শব্দের অর্থ পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা চলে। সেগুলি— অর্থের উৎকর্ষ, অর্থের অপকর্ষ, অর্থ সংকোচ, অর্থপ্রসার ও অর্থ সংশ্লেষ। শব্দার্থতত্ত্বে শব্দের আত্মিক দিক বিশ্লেষিত হয়। দেখা গেছে একই শব্দ একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ

করছে। যেমন—মাটি, হাত, পাকা ইত্যাদি শব্দ আমরা প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করলেও এটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দার্থতত্ত্বে এইসবও আলোচনা করা যায়।

ক. শব্দার্থ পরিবর্তন : এই পর্বে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা এই তিন শক্তিকে সামনে রেখে শব্দার্থ পরিবর্তনের দিক চিহ্নিত করা হয়।

খ. শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ : বিভিন্ন কারণে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। পরিবেশগত, মনস্তাত্ত্বিক, আরামপ্রিয়তা ও শৈথিল্য, আলঙ্কারিক। এই পর্বে সেগুলি বিশ্লেষণ করা হয়।

গ. শব্দার্থ পরিবর্তের ধারা: মূলত পাঁচটি ধারায় শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন — অর্থের উৎকর্ষ, অর্থের অপকর্ষ, অর্থের সংকোচন, অর্থের প্রসারণ ও অর্থের সংশ্লেষ। এই পর্বে এইসব আলোচনা করা হয়।

৩.২.৬.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।'

৩.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. ভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝ? ভাষা বিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ করে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, ও শব্দার্থতত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ-২

একক -৭
ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

বিন্যাস ক্রম :

৩.২.৭.১	:	ভূমিকা
৩.২.৭.২	:	বর্ণনামূলক বা এককালিক ভাষাবিজ্ঞান
৩.২.৭.৩	:	ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বা কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান
৩.২.৭.৪	:	তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান
৩.২.৭.৫	:	সহায়ক গ্রন্থাবলী
৩.২.৭.৬	:	আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.২.৭.১ : ভূমিকা

ভাষা সম্পর্কিত আলোচনা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনুসারে মুখ্যত দুরকমভাবে হতে পারে। (১) এককালিক বা বর্ণনামূলক (Synchronic/Descriptive) (২) কালক্রমিক বা ঐতিহাসিক (Diachronic/Historical) (৩) তুলনামূলক (Comparative)

৩.২.৭.২ : বর্ণনামূলক বা এককালিক ভাষাবিজ্ঞান

ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় কোনও একটি ভাষার অর্থ, রূপ, গঠন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকেই বলে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান। এইপ্রকার ভাষাবিজ্ঞানে সাধারণত ভাষার একটি কালের রূপ ধরে আলোচনা করা হয়। তাই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের আর এক নাম এককালিক 'ভাষাবিজ্ঞান। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Synchronic Linguistics. Syn মানে 'সঙ্গে', Chronic মানে 'কাল'। বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানে কোনও একটি ভাষার যে রূপ, গঠন, অর্থ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করা হয় তা মূলত ভাষার ব্যবহারিক রীতির দিক থেকে। কোনও একটি কালে ভাষার ব্যবহারিক গঠনরীতি অনুযায়ীই এই ভাষার বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন— বলিতে, চলিতে— এই শব্দ দুটিকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়— বলি + তে = বলিতে, চলি + তে = চলিতে, রূপ অনুযায়ী এটি ক্রিয়ার রূপ। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দুটি ভাগ (১) রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ও এককালিক ভাষাবিজ্ঞান একই বিষয় হলেও চার্লস এফ, হকেট-এর মতো ভাষাবিজ্ঞানী এই দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখানোরও চেষ্টা করেছেন।

ভাষার রূপ, গঠন, অর্থ ইত্যাদির মধ্যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা সীমায়িত বলে পরবর্তীকালে এই ধারা গঠনসর্বস্বতা বা অবয়ববাদী মতবাদ গড়ে ওঠে। এই অবয়ববাদ বা Structuralism -এর মূল বক্তব্য হল ভাষা শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন একসঙ্গে কাজ করে, একে অন্যকে প্রভাবিত করে (ভাষায় তেমনি বিভিন্ন উপাদানগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত)। সুইস্ ভাষাবিজ্ঞানী ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুর (Ferdinand de Saussure) -ই প্রথম এই মতবাদ দেন। পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীতে বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের অগ্রগতি দান করেন ভাষাবিজ্ঞানী আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি (Abraham Noam Chomsky) তাঁর রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণে (Transformation Generative Grammar)।

৩.২.৭.৩ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বা কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান

সাধারণভাবে ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় কোনও ভাষার উৎস, ইতিহাস, ক্রমবিকাশ আলোচনা বা পর্যালোচনা করা হয় তাকে বলে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বা Historical Linguistics. ভাষার উৎস — ইতিহাস জানতে গেলে যেহেতু কাল ধরে আলোচনা করতে হয়— তাই এর আর এক নাম কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান বা Diachronic Linguistics. কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানের আবার দুটি ধারা— (ক) ব্যক্তিবৃত্তীয় ভাষাতত্ত্ব বা ব্যক্তিগত ভাষার বিবর্তনতত্ত্ব (Linguistics Ontogeny) এবং (খ) জাতিবৃত্তীয় ভাষাতত্ত্ব বা সামগ্রিক ভাষার বিবর্তন তত্ত্ব (Linguistics Phylogency)।

একজন মানুষের জন্মের পর অর্থাৎ শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভাষাবোধ ও ব্যবহার পালটে পালটে যায়। এই বিষয়ে বিধিবদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা হয় ভাষাবিজ্ঞানের ব্যক্তিবৃত্তীয় ভাষাবিজ্ঞান অংশে। অপরপক্ষে জাতিবৃত্তীয় ভাষাতত্ত্বে আলোচিত হয় ব্যক্তি সমষ্টি দ্বারা গঠিত একটি ভাষাসম্প্রদায়ের ভাষাবোধ ও ব্যবহারের ক্রম পরিবর্তন প্রয়োজনের তাগিদেই। কোনও জনগোষ্ঠী যাযাবর জীবনে যে ভাষাবোধের পরিচয় দিয়েছিল, আধুনিক জীবনে পদার্পণ করে সেই ভাষাবোধ ও ভাষাসামর্থ্যের অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কোনও ভাষাসম্প্রদায়ের ভাষাবোধ ও ভাষা সামর্থ্যের কালক্রমিক ইতিহাসের দুটি পর্ব—

(১) ঐতিহাসিক পর্ব। যেখানে কোনও ভাষার উৎস, জন্ম-ইতিহাসের আলোচনা করা হয় লিখিত পুস্তক বা পুঁথি অথবা কোনও পাথুরে প্রমাণের উপর নির্ভর করে।

(২) প্রাগৈতিহাসিক পর্ব। ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ না পেলেও কল্পনার সাহায্যে অনেক সময় ঐতিহাসিক যুগেরও আগেকার মানব ভাষার বিবর্তনজনিত আলোচনা করা হয় কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রাগৈতিহাসিক পর্বে।

৩.২.৭.৪ : তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

ইংরেজিতে 'Comparative Linguistics' এর বাংলা পরিভাষা 'তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান'। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এই ধরনের আলোচনায় একাধিক ভাষার প্রয়োজন হয়। কারণ তুলনা কখনও একটি ভাষা দিয়ে সম্ভব হয় না। শুধু ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেই নয়, সাহিত্য চর্চার দিক থেকেও তুলনামূলক ভাবনার গুরুত্ব এখন অনেক বেশি। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা যায়— "ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় একাধিক ভাষার মধ্যে তুলনা করে তার উৎস, অতীত রূপ, প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশের রূপরেখা অঙ্কন করা যায়, তাকে 'তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান' বা Comparative Linguistics' বলে।

আগে অবশ্য তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একাধিক প্রাচীন ভাষার মধ্যে তুলনা করা হত। এখন প্রাচীন ভাষার আলোচনাতে এই প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ নেই। একাধিক আধুনিক ভাষার মধ্যে তুলনা করেও তাঁর অতীত রূপ, ইতিহাস, প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশের রূপরেখা নির্ণয় করা হয়। আগে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে বলা হত 'Philology' বা 'সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব'। কারণ এর দ্বারা কোনও ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করা হত। তার সঙ্গে থাকত প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধার থেকে ব্যাখ্যা সবই। অর্থাৎ প্রাচীন ভাষার সাংস্কৃতিক দিক উদ্ধার করা 'Philology'-এর একটা বড় কাজ ছিল। যে ভাষার সাহিত্যিক ঐতিহ্য নেই সেই ভাষা এক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়নি। পরবর্তীকালে Philology শব্দটি ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হতে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইংরেজি 'Comparative' শব্দটি। ফলে একাধিক প্রাচীন ভাষার মধ্যে তুলনার অবকাশ চলে আলে। নাম হয় তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বা 'Comparative Philology' -অবশ্য বর্তমান কালে তা রূপ পেয়েছে 'Comparative Linguistics'-এ।

এখানে একটি কথা জেনে রাখা ভালো, Philology- এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভাষা, সাহিত্যিক ঐতিহ্য, উপাদান ইত্যাদি।

৩.২.৭.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।'

৩.২.৭.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ-২

একক -৮
বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব

বিন্যাস ক্রম :

৩.২.৮.১ : বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব

৩.২.৮.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.২.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.২.৮.১ : বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব :

একথা ঠিক আর্যরা আসার আগে অনার্যরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মূলত রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্রভূমিতে। এই সমস্ত এলাকার নামগুলি বিশ্লেষণ করলেই ওখানকার মানুষের ভাষা, উচ্চারণরীতি, শব্দভাণ্ডার ইত্যাদিতে অনার্যের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যায়। বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাবকে মূলত কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন—

ক. অস্ট্রিক প্রভাব

খ. দ্রাবিড় প্রভাব

গ. ভোট চিনীয় প্রভাব

অস্ট্রিক প্রভাব : অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে অনেক উদ্ভিদ, জীবজন্তু ইত্যাদির ব্যবহারিক পরিভাষা, শব্দ, ব্যাকরণের নিয়ম বাংলা ভাষায় এসেছে। সেগুলি নিম্নরূপ—

১. এক সময় গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত, নিরক্ষর মানুষের মধ্যে কোনও কিছু গোনার ক্ষেত্রে কুড়ি বা গণ্ডা দ্বারা বোঝানো হত। এটিও অস্ট্রিক প্রভাবের ফলে হয়েছে। যেমন—

এক গণ্ডা পান।

এক কুড়ি বয়স।

২. আধুনিক কালে বাংলায় স্বরসঙ্গতির ব্যাপারটা অস্ট্রিক ভাষাতে লক্ষণীয়। যেমন—

তুলা > তুলো

মূলা > মুলো,

সুতা > সুতো ইত্যাদি।

৩. বাংলা ক্রিয়াপদে লিঙ্গহীনতার ব্যাপারটা অস্ট্রিক প্রভাবজাত। যেমন— সন্তান, ছেলেবেলা ইত্যাদি।

৪. বাংলা ভাষায় কিছু শব্দকে তৎসম বলা হয়, সেগুলির অনেক শব্দই আবার অস্ট্রিক থেকে সংস্কৃতে এসেছে। যেমন— 'তাম্বুল' শব্দটি আর্য ভাষার কোনও শাখাতেই নেই। এই রকম— মরিচ, বাণ, কম্বল ইত্যাদি শব্দও অস্ট্রিক থেকে সংস্কৃত হয়ে বাংলায় এসেছে।

৫. বাংলায় ধ্বনাত্মক ও ভাবাত্মক শব্দটির মূলে রয়েছেন অনার্যপ্রভাব। যেমন— শনশন, বনবন, পতপত, টনটন, টাপুর-টুপুর ইত্যাদি। উল্লেখ্য 'বঙ্গ' শব্দটাও অস্ট্রিক প্রভাবজাত বলে অনেকে মনে করেন।

দ্রাবিড় প্রভাব : বাংলায় অনেক স্থান নাম, উচ্চারণ রীতি, ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি দ্রাবিড় থেকে এসেছে। যেমন—

১. অনেক ধ্বনাত্মক শব্দ দ্রাবিড় থেকে বাংলায় এসেছে। যেমন— ধবধবে, ঝমঝম ইত্যাদি।

২. শব্দের আদিতে বাংলা ভাষায় যে শ্বাসাঘাত পড়ে, সেটিও দ্রাবিড় প্রভাবজাত। যেমন—

আখ > আক

দুধ > দুদ্।

মাছ > মাচ্ ইত্যাদি

উল্লেখ্য এর ফলে পরবর্তী মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হওয়ার রীতি এখনও বাংলা ভাষায় স্পষ্ট।

৩. বাংলা ভাষার উপভাষা বঙ্গালীতে যে 'হ' কারলোপের প্রবণতা দেখা যায়, তা দ্রাবিড় প্রভাবজাত। যেমন—

ভাই > বাই

ধান > দান প্রভৃতি।

৪. বাংলা ভাষায় যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রভাব দ্রাবিড়জাত। যেমন— স্নান করা, শয়ন করা, গমন করা প্রভৃতি।

৫. আদিতে 'চ' বর্গের উচ্চারণ ছিল পৃষ্ঠ কিন্তু দ্রাবিড় প্রভাবে প্রাকৃত পর্ব থেকেই তা ঘৃষ্ট হয়ে যায়। বাংলা ভাষায়ও সেই রীতি বর্তমান।

৬. শুধু বাংলা কেন সমগ্র ভারতীয় বর্ণমালার মূর্ধন্য ধ্বনি দ্রাবিড় প্রভাবেই এসেছে। উল্লেখ্য সুইডিস ভাষা ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও ভাষাতেই মূর্ধন্য ধ্বনির ব্যবহার নেই।

ভোট চিনীয় প্রভাব : এই ভাষা বংশের প্রভাবগুলি নিম্নরূপ—

১. এই ভাষা বংশ থেকে অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। যেমন — লুঙ্গি, ফুঙ্গি, চা, লিচু, চিনি প্রভৃতি।

২. বাংলা ভাষার বঙ্গালী উপভাষায় 'অ্যা' ধ্বনির প্রয়োগ দেখা যায়। এটিও ভোট-চিনীয় প্রভাবজাত। যেমন—

বেশ > ব্যাশ

দেশ > দ্যাশ

তেল > ত্যাল ইত্যাদি।

৩. শিষ ধ্বনিগুলির মধ্যে উচ্চারণের পার্থক্যহীনতা ভোট-চিনী প্রভাবজাত। যেমন—

আশ > আস

মাষ্টার > মাস্টার

ষ্টেশন > স্টেশন প্রভতি।

৪. উত্তর বা পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষা বংশের প্রভাব কম। বেশি ভোট-চিনী ভাষা বংশের প্রভাব। যেমন—

(ক) ভ, ধ, ঘ, ড় প্রভৃতি বর্ণ ব, দ, গ, র, রূপে উচ্চারিত।

(খ) চ বর্গের সমস্ত বর্ণ দন্ত্য তালব্য ঘৃষ্ট রূপে উচ্চারিত।

(গ) এইসব অঞ্চলের কিছু প্রাদেশিক শব্দ 'গম', 'বেরয়া',

'তাম্বু' ইত্যাদি শব্দ গৃহীত। আদর্শ বাংলায় এইসব শব্দের অর্থ যথাক্রমে 'ভাল', 'মন্দ', 'সূর্য' ইত্যাদি।

৩.২.৮.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।'

৩.২.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ-২

একক -৯

বাংলা ভাষায় বিদেশি প্রভাব

বিন্যাস ক্রম :

৩.২.৯.১	:	বাংলা ভাষায় বিদেশি প্রভাব
৩.২.৯.২	:	পর্তুগীজ প্রভাব
৩.২.৯.৩	:	ওলন্দাজ প্রভাব
৩.২.৯.৪	:	সহায়ক গ্রন্থাবলী
৩.২.৯.৫	:	আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.২.৯.১ : বাংলা ভাষায় বিদেশি প্রভাব

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে বিদেশি প্রভাবে কী কী পরিবর্তন হয়েছিল তা আলোচনা করা যেতে পারে। এই প্রভাবটা ছিল মূলত উচ্চারণগত, ব্যাকরণগত ও শব্দগ্রহণগত।

ফরাসি প্রভাব : বাংলা ভাষায় ফরাসি প্রভাব বেশ অনেকটাই। মুসলমানদের দীর্ঘকালীন রাজত্বের ফলে বহু ফরাসি শব্দ বা ফরাসিপ্রভাব জাত তুর্কি বা আরবি শব্দ বাংলা ভাষায় থেকেই যায়। ফরাসি শব্দ আইন-আদালত সংক্রান্ত, রাজস্ব সংক্রান্ত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ইসলামধর্ম সংক্রান্ত, শিখা-সাহিত্য সংক্রান্ত বা সাধারাণ দ্রব্য সংক্রান্ত ইত্যাদি অর্থে বাংলা ভাষায় এখনও বিরাজ করছে। যেমন—

প্রশাসন সংক্রান্ত শব্দ : আইন, আদালত, আসামি, খাজনা, হাকিম, উকিল, মোকদ্দমা, মহকুমা, দপ্তর, সালিস, জরিমানা, কয়েদ, জবানবন্দী, গোমস্তা, খারিজ, তামিল, দলিল, মুনসেফ ইত্যাদি।

রাজদরবার বা যুদ্ধ সংক্রান্ত শব্দ : মালিক, আমির, তপ, দরবার, সেপাই, সওয়ার, হুজুর, তাঁবু, ওমরাহ, উজির প্রভৃতি।

শিক্ষা-সংস্কৃতি সংক্রান্ত শব্দ : আদম, কাগজ, কেতাব, খাতা, নকল, তরজমা, কলম, সেতার, শাগরেদ, হরফ, মাদ্রাসা, কেচ্ছা, মুনশি, বয়েৎ, গজল ইত্যাদি।

ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ : আল্লা, ঈদ, কাফের, কাবা, খোদা, গাজি, জবাই, দরগা, দোয়া, নামাজ, ফেরেস্তা, মুরিদ, মসজিদ, মহারম, মোল্লা, হালাল, শরিদ, শিয়া, ফকির, হজ, দীন, দরবেশ, কোরবানি প্রভৃতি।

জাতিবাচক বা ব্যবসাবাচক শব্দ : হিন্দু, ফিরিঙ্গি, দোকানদার, কসাই, চাকর, যাদুকর, কারিগর, বাজিকর ইত্যাদি।

শুধু শব্দভাণ্ডারের দিক থেকেই নয়, বাংলা ব্যাকরণেও ফরাসি প্রভাব বিদ্যমান। যেমন—

১. বাংলা ভাষায় লিঙ্গ নির্দেশ ফারসি প্রভাবজাত। যেমন—

মর্দ্দাকুকুর > মাদীকুকুর

গাওনর (ষাঁড়) > গাওমাদা (গাভী) ইত্যাদি।

২. বহুবচন প্রত্যয় হিসেবে 'ত' এর ব্যবহার ফারসি প্রভাবজাত। যেমন—

দলিলাত, কাগজাত প্রভৃতি।

৩. ফারসি শব্দের সংস্কৃতায়ন করা হয়েছে এবং যেগুলি পরবর্তীতে বাংলা ভাষায় এসেছে।

যেমন — baqi > বক্রি ইত্যাদি।

আরবি প্রভাব : বাংলা শব্দে ফারসির মতোই আরবি শব্দের বিরাট প্রভাব আছে। বহু আরবি শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত। শুধু তাই নয়, বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও আরবি প্রভাব বিদ্যমান। যেমন —

প্রশাসনসংক্রান্ত শব্দ : আমিন, উকিল, এজলাস, ওকালতি, কৈফিয়ৎ, জালিয়াতি, তলব, তারিখ, নায়েব, মাতব্বর, সাকেব, হাজির, হুকুম, হেফাজত, মালিক ইত্যাদি।

নিত্য ব্যবহার্য ও নানাবিধ শব্দ : আজব, আক্কেল, ইজ্জত, ইমান, ইমারত, আতর, আফিম, আসবাব, খেলাপ, কায়দা, ইস্তফা, ওজন, এলেম, জিনিস, খাতির, মশলা, বদল, হালুয়া, সরবতি, সাহেব, তামাশা, তবলা, দোয়াত, কায়দা, কাগজ, জিম্মা, খারাপ, মালুম, মিছিল, ইশারা প্রভৃতি।

বাংলা ব্যাকরণের অনেক পরিবর্তন আরবি প্রভাব জাত। যেমন—

১. ফারসির মতো 'বে' উপসর্গের ব্যবহার আরবি প্রভাবের ফলে এসেছে।

উদাহরণ — বে-আক্কেল, বেইমান, বেইজ্জত, বেকায়দা ইত্যাদি।

২. বাংলা ব্যাকরণে সংযোজক অব্যয় হিসেবে 'ও' এর ব্যবহার আরবি প্রভাবজাত। যেমন—

আদিত্যবাবু ও প্রবীরবাবু একসঙ্গে ডিপার্টমেন্ট গেলেন।

আরবি-ফারসি মিশ্রণজাত শব্দ : বাংলা ভাষার আরবি-ফারসি মিশ্রণজাত শব্দের ব্যবহার প্রচুর। উন্মেষ পর্বের গদ্যে আরবি— ফারসি মিশ্রণজাত বহুল শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা ভাষায় এমন শব্দের ব্যবহার খুবই বেশি। যেমন— আদমশুমার, কোহিনূর ইত্যাদি আরবি-ফারসি। মিশ্রণজাত শব্দ মূলত বাংলা ব্যাকরণের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলেছে। যেমন —

১. বহুবচনের 'হা' 'ন' ও 'ত' ইত্যাদির ব্যবহার আরবি-ফারসি প্রভাবজাত। যেমন—

দলিল > দলিলাত

গ্রাম > গ্রামহা

জমিন > জমিনহা

মহাজন > মহাজননা প্রভৃতি।

২. বাংলা ব্যাকরণে গিরি, দার, দারি ইত্যাদি প্রত্যয় আরবি-ফারসি প্রভাবেই এসেছে। উদাহরণ—

মোক্তার > মোক্তার + গিরি = মোক্তারগিরি

খাতির > খাতির + দারি = খাতিরদারি

৩. বাংলা ব্যাকরণে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যাবহার আরবি-ফারসি প্রভাবজাত। যেমন—

তলপ করিয়া

খালাস করিয়া ইত্যাদি।

তুর্কিপ্রভাব : আরবি ফারসির মতো তুর্কি শব্দও বাংলা ভাষাকে প্রভাবিত করেছে। যেমন— বিবি, বেগম, দারগা, কুলি, চাকু, গালিচা, আলখাল্লা, চকমকি ইত্যাদি শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

৩.২.৯.২ : পর্তুগিজ প্রভাব

ভারতবর্ষে এসে পর্তুগিজ নাবিকরা পশ্চিম উপকূলে বসবাস করতে থাকে। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা কালিকট বন্দরে আসেন। ইনিই প্রথম পর্তুগিজ নাবিক। এরপর একে একে পর্তুগিজ শাসনকর্তারা ভারতবর্ষের অনেক অংশ শাসন করতে থাকে। এদের প্রভাব বাংলায় এত বেশি পড়েছিল যে ইংরেজরা এদেশে আসার আগে অনেকেই পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলতে থাকে। ফলে দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত অনেক পর্তুগিজ শব্দ বাংলা ভাষায় মিশেছে। যেমন— সাবান, তামাক, আলমারি, ইস্পাত, আলকাতরা, কামরা, কপি, কেদারা, গুদাম, মিস্ত্রি, পিস্তল, পেরেক, ফিতা, বালতি, বেহালা, নিলাম, জালা, বোমা ইত্যাদি শব্দ।

৩.২.৯.৩ : ওলন্দাজ প্রভাব

পর্তুগিজের সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজ বণিকরাও ভারতবর্ষে এসেছিল। এদের প্রভাবেও বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ এসেছে। বিশেষত তাস খেলার অনেক শব্দ ওলন্দাজ ভাষা থেকে আগত। যেমন— হরতন, রুইতন, তুরুপ, ইস্কাবন, কর্ক, পিমপাস প্রভৃতি।

ইংরেজি প্রভাব : বাংলা ভাষায় প্রচুর পরিমাণেই ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন— টেবিল, চেয়ার, পিয়ন, টেলিফোন, পুলিশ, বাস, লরি, বোনাস, ট্রেন, ট্যাক্সি, টিকিট, স্কুল, কলেজ, স্টেশন, ব্যাগ, পেনসিল, পেন, মাস্টার, মাইল, ম্যানেজার, পেনশন ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, পর্তুগিজ ও ইংরেজি প্রভাব শুধু বাংলা শব্দভাণ্ডারে নয়, বাংলা ব্যাকরণেও নানাবিধ পরিবর্তন এনেছে। যেমন—

১. বাংলা ব্যাকরণে সমপিকা ক্রিয়ার পরে কর্মকারক বসানোর রীতিটি মূলত পর্তুগিজ ও ইংরেজি ব্যাকরণের প্রভাবজাত। উদাহরণ — এখন আমাদের খেতে দাও ভাত।

২. প্রথমে প্রধান বাক্য তার পরে আশ্রিত বাক্যের প্রয়োগটি ও পর্তুগিজ ও ইংরেজি প্রভাব জাত। যেমন—

   'অনেক কাল আগে এই বনের মধ্যে রাজারা বাস করতো,
   তাই সেখান থেকে কৃষ্ণদয়ালের মোহর পাওয়া হল।'

৩. বাংলা ব্যাকরণে অসমাপিকা ক্রিয়ার বিধেয় প্রয়োগ ও ব্যাকরণের নিয়ম-রীতির নির্দিষ্ট প্রয়োগও পর্তুগিজ ও ইংরেজি প্রভাবজাত।

৪. ইংরেজির মতো বাংলা বিশেষ্যের আগে বিশেষণ বসে। যেমন— ভালো ছেলে (Good boy), সুন্দর ফুল (Beautiful flower) ইত্যাদি।

৫. বাংলা কবিতায় প্রতিনিয়ত যে নিত্য নতুন গদ্য ছন্দ ব্যবহার হচ্ছে তাও ইংরেজি প্রভাবজাত। এইসব বিদেশি প্রভাব ছাড়াও বাংলা ভাষায় ফরাসি, স্প্যানিস, পর্তুগাল, ইতালীয়, চিনা, জাপানি, ব্রহ্মদেশীয়, মালয়দেশীয় ও তিব্বতীয় ভাষার প্রভাবও বিদ্যমান। ভারতের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে ইতালি, স্পেন বা পর্তুগালের বাণিজ্যিক যোগ ছিল। জাপান, চিন বা ব্রহ্মদেশের সঙ্গেও ভারতবর্ষের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যিক লেনদেন চলত। সেই হিসাবে বিদেশি এই ভাষাগুলির নানা শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে, বাংলা ভাষা হিসেবে আমাদের মুখে মুখে আজও চলে আসছে। যেমন—

ইতালিয় প্রভাব : কোম্পানি, ম্যালেরিয়া, ফ্রেস্কো, পার্ক ইত্যাদি।

স্প্যানিশ প্রভাব : গেরিলা, নিগ্রো, কর্ক প্রভৃতি।

মালয়দেশীয় প্রভাব : সাগু, গুদাম ইত্যাদি।

ব্রহ্মদেশীয় প্রভাব : লুঙ্গি, ফুঙ্গি, প্যাগোডা প্রভৃতি।

জাপানি প্রভাব : রিক্সা, হাসুনহানা ইত্যাদি।

চিনা প্রভাব : লিচু, চা প্রভৃতি।

তিব্বতী প্রভাব : লামাই ইত্যাদি।

দক্ষিণী প্রভাব : জেব্রা প্রভৃতি।

৩.২.৯.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।'

৩.২.৯.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা ভাষায় বিদেশি প্রভাব সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক - ১০

বাংলা রূপতত্ত্ব (বিশেষ্য, অব্যয়, প্রত্যয়, অনুসর্গ, বিভক্তি)

বিন্যাস ক্রম :

৩.৩.১০.১ : বিশেষ্য

৩.৩.১০.২ : অব্যয়

৩.৩.১০.৩ : প্রত্যয়

৩.৩.১০.৪ : অনুসর্গ

৩.৩.১০.৫ : বিভক্তি

৩.৩.১০.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

৩.৩.১০.৭ : আদর্শ প্রশ্নমালা

৩.৩.১০.১ : বিশেষ্য

বিশেষ্য পদটি ইংরেজিতে 'Noun' আরবি-ফারসিতে 'ইসম'। অর্থাৎ 'ইসম' শব্দটির অর্থ নাম। বিশেষ্যকে অনেকে বলেছেন নামশব্দ বা নামপদ। যাই হোক, 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে সুনীতিকুমার বিশেষ্য পদের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

"যে শব্দ, দৃষ্ট অথবা অদৃষ্ট, চক্ষু-কর্ণ-মন আদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য অথবা ইন্দ্রিয় বহির্ভূত অনুভূতিসাপেক্ষ কোনও পদার্থর নাম, এবং যাহাকে বাক্য মধ্যে অবস্থিত অথবা উহ্য বা ধর্মবাচক অন্য কোনও শব্দ বা শব্দাবলী দ্বারা জাতি বা শ্রেণী হইতে পৃথক বা বিশিষ্ট করা যায়, সেই রূপ শব্দকে নাম বা সংজ্ঞা অথবা বিশেষ্য বলে।"

বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ্যর এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ হয় না। বাংলায় বিশেষ্যকে নয় ভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু সুনীতিকুমার বলেছেন সাতটির কথা। যাইহোক এবারে বিশেষ্যর শ্রেণীবিভাগ করা হল।

১. সংজ্ঞাবাচক (Proper) বিশেষ্য।

২. জাতিবাচক (Common) বিশেষ্য।

৩. বস্তুবাচক (Material) বিশেষ্য।

৪. সমষ্টিবাচক (Collective) বিশেষ্য।

৫. সংখ্যাবাচক (Cardinals) বিশেষ্য।

৬. গুণবাচক (Abstract) বিশেষ্য।

৭. অবস্থাবাচক (Abstract-Concrete) বিশেষ্য।

৮. ভাববাচক (Abstract) বিশেষ্য।

৯. ক্রিয়াবাচক (Verbal) বিশেষ্য।

এরই মধ্যে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় গুণবাচক, অবস্থাবাচক ও ভাববাচক বিশেষ্যকে একত্রে ভাব/ গুণবাচক বলেছেন। কিন্তু দেখা গেছে গুণ, অবস্থা ও ভাবের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যেমন—মেধা, প্রতিভা, বুদ্ধি এগুলি মানুষের এক-একটি গুণ। আবার কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য এগুলি মানুষের জীবনের এক-একটি ভাব। অনেকে আবার ক্রিয়াবাচক ও ভাববাচক বিশেষ্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য রেখা টানেন নি কিন্তু ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে এগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যে মনোভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত আনন্দ-বেদনা-হাসি-কান্না ইত্যাদি। আবার আহার-নিদ্রা, বাঁচন-মরণের মধ্যে মূলত ক্রিয়াই প্রধান। যাই হোক, এবারে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদের দ্বারা কোনও ব্যক্তি, বস্তু, দেশ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির নাম বোঝানো হয় তাকে বলে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য। যেমন—

ক. **স্বামী বিবেকানন্দ** ভারতের দার্শনিক।

খ. **হিমালয়** ভারতের উত্তরে অবস্থিত।

গ. আমাদের দেশের নাম **ভারতবর্ষ**।

ঘ. **দামোদর** নদী সাঁতরে **বিদ্যাসাগর** মায়ের কাছে গিয়েছিলেন।

জাতিবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্যের দ্বারা কোনও জাতি বা একই ধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তি বা প্রাণিকে বোঝানো হয়ে থাকে তাকে বলে জাতিবাচক বিশেষ্য। যেমন—

ক. **গোরু** মাঠে চরে।

খ. **পাখিরা** গান গায়।

গ. **মানুষ** মরণশীল প্রাণী।

ঘ. **পশুরা** বনে থাকে।

বস্তুবাচক বিশেষ্য : এই ধরনের বিশেষ্য পদে কোনও বস্তু বা জিনিসের নাম বোঝায়। যেমন—

ক. **দুধের** কোনও বিকল্প নেই।

খ. **সন্দেশ** খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

গ. **আকাশে** চাঁদ উঠেছে।

ঘ. **সোনার** দাম দিনদিন বাড়ছে।

সমষ্টিবাচক বিশেষ্য : এই ধরনের বিশেষ্য পদে জাতিবাচক বিশেষ্যের সমষ্টি বোঝা যায়।

ক. **ভীড়** বাসে চলাফেরা খুব কষ্টকর।

খ. **সমিতির** নির্বাচনে অপূর্ব এবারে দাঁড়াবে।

গ. আকাশে এক **ঝাঁক** পায়রা উড়ছে।

ঘ. বিকালে সুনীলবাবুর স্মরণ **সভা** বসবে।

সংখ্যাবাচক বিশেষ্য : কখনও গাণিতিক সংখ্যাবাচক শব্দগুলি বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হলে সংখ্যাবাচক বিশেষ্য হয়ে থাকে। যেমন—

ক. **দশে** মিলি করি কাজ।

খ. আমি তোমার **সাতে** নেই **পাঁচে** নেই।

গ. **উনিশ-বিশে** কোনও তফাৎ নেই।

ঘ. **শতশত** মানুষ সেখানে গিয়েছিল।

গুণবাচক বিশেষ্য : এই ধরনের বিশেষ্য পদে কোনও প্রাণি বা বস্তুর দোষগুণ ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে থাকে। যেমন—

ক. **প্রতিভা** থাকলে জীবনে বড় হওয়া যায়।

খ. মানুষের পতনের মূলে রয়েছে **অহংকার**।

গ. অপরাধীকে **ক্ষমা** করো।

ঘ. **সাহসী** মানুষ অনেক দেখেছি।

অবস্থাবাচক বিশেষ্য : এই ধরনের বিশেষ্য পদে কোনও প্রাণি বা বস্তুর অবস্থা অনুধাবন করা হয়। যেমন—

ক. **যৌবনে** সকলের মনেই উন্মাদনা আসে।

খ. **দারিদ্র্য** মানুষকে অসহিষ্ণু করে তোলে।

গ. **জন্মালে** মৃত্যু হবেই।

ঘ. **শৈশবে** খেলা করো।

ভাববাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদে কোনও প্রাণির মনের ভাব প্রকাশিত হয় তাকে বলে ভাববাচক বিশেষ্য। যেমন—

ক. মধুরিমা বিয়ের **আনন্দে** আত্মহারা হয়েছে।

খ. **হিংসা** নিজেরই ক্ষতি করে।

গ. **সুখ-দুখ** দুই ভাই, সবার জীবন ঘিরে রয়।

ঘ. পিকনিকে গিয়ে ছেলেরা **উল্লাস** করছে।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য : এই ধরনের বিশেষ্য পদে কোনও কাজের নাম বোঝা যায়। যেমন—

ক. রাতে সকলেরই **ঘুমানো** উচিত।

খ. বাঁচতে হলে পুষ্টিকর খাবার **খেতে** হবে।

গ. আমি তো **লিখেই** চলেছি, কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছে না।

ঘ. গরিবের **কান্নার** কোনও দাম নেই।

এতো গেল সাধারণ ভাবে বিশেষ্যর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা। এবার এই ন' প্রকার বিশেষ্যকে রূপের দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ করা হল। যেমন—

রূপাত্মক (Concrete) : এই ধরনের বিশেষ্য পদরূপ গ্রাহ্য। অর্থাৎ চোখে দেখে এর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। সাধারণত সংজ্ঞাবাচক, জাতিবাচক, বস্তুবাচক, সমষ্টিবাচক—এই চার ধরনের বিশেষ্য হইল রূপাত্মক বিশেষ্য।

অরূপাত্মক (Abstract) : এই শ্রেণীর বিশেষ্য পদকে চোখে দেখা যায় না। সাধারণত গুণবাচক, ভাববাচক, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

অর্ধরূপাত্মক (Abstract Concrete) : এই ধরনের বিশেষ্য পদকে চোখে দেখা যায় না ঠিকই, কিন্তু এদের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। মূলত অবস্থাবাচক ও সংখ্যাবাচক বিশেষ্য এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। অনেক সময় আবার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যও যেমন—শিশু-কিশোর, দিন-রাত, জন্ম-মৃত্যু, সাত-পাঁচ, হাসি-কান্না ইত্যাদি।

৩.৩.১০.২ অব্যয়

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অব্যয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

'বাক্য-গত উক্তিকে এবং বাক্যস্থ অন্যান্য পদগুলির পরস্পরের সম্বন্ধকে স্থান, কাল, পাত্র ও প্রকার বিষয়ে সুপরিস্ফুট করিয়া দেয়, এমন পদকে অব্যয় বলে।”

অব্যয়কে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি এইরকম—

১. পদান্বয়ী অব্যয়

২. সমুচ্চয়ী অব্যয়

৩. অনন্বয়ী অব্যয়

৪. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

পদান্বয়ী অব্যয় : এই ধরনের অব্যয়ে বাক্য মধ্যে একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সম্বন্ধ বা যোগ সৃষ্টি হয়।

এই ধরনের অব্যয়ের পূর্ব পদে বিভক্তি চিহ্নের প্রয়োগ থাকে। প্রয়োগের দিক থেকে এই ধরনের অব্যয় পাঁচভাগে পদ বা বাক্যকে যুক্ত করে। যেমন—

অবস্থানবাচক অব্যয় : এই ধরনের অব্যয়গুলি হল সঙ্গে, সহিত, পিছনে, ভিতরে, পাশে, নীচে, উপরে ইত্যাদি।

উপমাবাচক অব্যয় : মতো, ন্যায়, সব, তুল্য, যেন, প্রায় এইসব অব্যয় এই পর্বের উদাহরণ।

সীমাবাচক অব্যয় : এই পর্বে থেকে, পেরিয়ে, পর্যন্ত, অবধি ইত্যাদি শব্দের উদাহরণ পাওয়া যায়।

ব্যতিরেকাত্মক অব্যয় : ব্যতীত, বিনা, ভিন্ন, ছাড়া, ব্যতিরেকে ইত্যাদি অব্যয় এই পর্বের উদাহরণ।

অনুসর্গাত্মক অব্যয় : এই পর্বে প্রতি, উদ্দেশ্য, বোধ, নিমিত্ত, দরুন ইত্যাদি অব্যয়ের উদাহরণ পাওয়া যায়।

সমুচ্চয়ী অব্যয় : এই ধরনের অব্যয় একাধিক পদ বা বাক্যের মধ্যে কখনও সংযোগ, কখনও বা বিয়োগ সাধন করে। অর্থাৎ যোগ বিয়োগের মধ্যেই সমুচ্চয়ী অব্যয়ের সার্থকতা। এই ধরনের অব্যয়ের আটটি শ্রেণী আছে।

সংযোজক : এই ধরনের অব্যয়ে দুই বা তার বেশি বাক্য বা পদকে যুক্ত করে। যেমন—রাম **ও** শ্যাম, তিনি বাড়িতে গেলেন **এবং** খেতে বসলেন।

বিয়োজক অব্যয় : এই ধরনের অব্যয় দুই বা তার বেশি বাক্য বা পদকে আলাদা কর। যেমন—তুমি নিজে যাও, না হয় ভাইকে পাঠাও। আবার বলা যায়—

অমল **বা** কমলকে ডেকে আনো।

ব্যতিরেকাত্মক : এই শ্রেণীর অব্যয়ে অভাব বা ভেদ অর্থের প্রকাশ ঘটায়। যেমন—সত্যি কথা বল **নয়তো** তোমার নির্বাসন অনিবার্য। আবার বলা যায়—

মন দিয়ে পড়াশোনা কর **নচেৎ** ফেল করবে।

সঙ্কোচক : এই ধরনের অব্যয় স্বাভাবিক ফল না বুঝিয়ে বিপরীত ফলটা বুঝিয়ে থাকে। যেমন—আমাকে জেলে দিন **তবুও** স্বদেশী গান গাইবই। আবার বলা যায়—

জীবনে দুঃখ পাব **তবুও** অসৎ হব না।

হেতুবাচক : এই ধরনের অব্যয় হেতুকে সামনে রেখে দুটি বাক্যকে যোগ করে। যেমন—তার ছেলে অসুস্থ **বলে** তিনি অফিসে এলেন না। আবার বলা যায়—

আমি আজ কলেজে যাইব **কেননা** আজ আমার পরীক্ষা।

সিদ্ধান্তবাচক : মীমাংসার জন্যে সিদ্ধান্ত করে দুটো বাক্যকে যুক্ত করে এই ধরনের অব্যয়। যেমন—

এটা আমার গুরুর আদেশ, **কাজেই** আমাকে যেতে হইবে। আবার বলা যায়—সকলেই ভাত খেলেন **সুতরাং** আমাকেও খেতে হল।

সংশয়সূচক : এই ধরনের অব্যয় বাক্যের মধ্যে সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ করে। যেমন—

ছেলেটা **বুঝি** পাগল। আবার বলা যায়—পড়া শেষ না করলে **যদি** তিনি রেগে যান।

নিত্যসম্বন্ধী : নিত্য সম্বন্ধযুক্ত দুটি অব্যয় এখানে দুটি বাক্যকে যুক্ত করে। যেমন—

তিনি অশিক্ষিত **বটে, কিন্তু** অসভ্য নন। আবার বলা যায়—**হয়** পড়াশোনা কর, **নতুবা** হস্টেল ছাড়ো।

অনন্বয়ী অব্যয় : এই ধরনের অব্যয়ের সঙ্গে বাক্যের অন্য কোনও পদের ব্যাকরণগত কোনও সম্বন্ধ বা যোগ থাকে না। এই ধরনের অব্যয়ের চারটি শ্রেণী। যেমন—

ভাবপ্রকাশক : এই ধরনের অব্যয় দ্বারা মনের বিবিধ ভাব যেমন—আনন্দ, দুঃখ, রাগ, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ করা সম্ভব। এই ধরনের অব্যয়ের আবার ছটি শ্রেণী আছে। যেমন—

ক. অনুমোদন-প্রশংসা-হর্ষজ্ঞাপন : মরি মরি!, বেশ!, শাবাশ শাবাশ ইত্যাদি।

খ. বিস্ময়ব্যঞ্জক : বটে!, ওবাবা!, ওমা! প্রভৃতি।

গ. ভয়-দুঃখ-যন্ত্রণাজ্ঞাপক : ওরে বাবা!, হায় হায়!, মাগো! ইত্যাদি।

ঘ. ঘৃণা ও বিরক্তিসূচক : দূর দূর!, আমলো!, কি বিপদ! প্রভৃতি।

ঙ. শোকসূচক : আহা!, মরি মরি! ওই যা! ইত্যাদি।

চ. সম্মতি বা অসম্মতিজ্ঞাপক : আচ্ছা!, উঁহু! প্রভৃতি।

সম্বোধনসূচক : এই ধরনের অব্যয়ের মাধ্যমে কাউকে সম্বোধন করা হয়। সম্বোধনেই এই অব্যয়ের সার্থকতা। যেমন—**ওগো** তোমরা সবাই এখানে এসো। আবার বলা যায়—**হে** বন্ধু, আজ বিদায় নিচ্ছি।

প্রশ্নবোধক : এই শ্রেণীর অব্যয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন—তোরা **কি** আজই চলে যাচ্ছিস? আবার বলা যায়—কেমন, ভালো **তো**?

বাক্যালঙ্কার : সাধারণত এই ধরনের অব্যয় যেকোন বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য এই সব অব্যয়ের নিজস্ব কোনও অর্থ প্রকাশ পায় না ঠিকই কিন্তু বাক্যটির অর্থে একটা বৈচিত্র্য আসে। যেমন—বোঝাবার ত্রুটি তো করিনি, কিন্তু বোঝে না **যে**। আবার বলা যায়—আপনি যে কাল **বড়ো** এলেন না।

ধ্বন্যাত্মক অব্যয় : এই ধরনের অব্যয়ের আর একটি নাম অনুকার অব্যয়। এই অব্যয়ের সংজ্ঞায় বলা যায়, এইসব অব্যয় বাস্তব ধ্বনির ব্যঞ্জন দিয়ে এক অনির্বচনীয় সূক্ষ্ম ভাবের দ্যোতনা দেয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—ছলছল, টনটন, কনকন, সনসন, ঝনঝন ইত্যাদি। এই ধরনের দুটি শ্রেণী যেমন—অনুকার ধ্বন্যাত্মক ও ভাবপ্রকাশ ধ্বন্যাত্মক।

অনুকার ধ্বন্যাত্মক : এই ধরনের অব্যয় কখনও এককে বসে কখনও বা দ্বিত্বে প্রয়োগ হয়। যেমন—হিহি, ধেইধেই, খকখক, ঝমঝম, ঢকঢক, দরদর, টুংটাং ইত্যাদি। ভাষার ধ্বন্যাত্মক অব্যয়গুলির নাম বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণ হিসাবে প্রয়োগ হয়।

ভাবপ্রকাশ ধ্বন্যাত্মক : এই ধরনের অব্যয় বাস্তব ধ্বনির প্রকাশ না করে ভাবের দ্যোতনা সৃষ্টি করে। যেমন—

ক. শূন্যতা বা পূর্ণতা জ্ঞাপক : থইথই, খাঁখাঁ, ধুধু ইত্যাদি।

খ. নাম বিশ্লেষণ বা বিশেষণের বিশেষণ রূপে—গনগনে, টিমটিমে, লিকলিকে, দগদগে, ঘুটঘুটে প্রভৃতি।

গ. অনুভূতি প্রকাশক : ছমছম, দুরুদুরু, ঝিমঝিম, ছলছল ইত্যাদি।

ঘ. বর্ণবৈচিত্র্যজ্ঞাপক : কুচকুচে, ধবধবে, টুকটুকে প্রভৃতি।

৩.৩.১০.৩ প্রত্যয়

প্রত্যয় সম্পর্কে বলা হয় যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলে প্রত্যয়। এক বর্ণের প্রত্যয়গুলি হল—অ, আ, ই, ঈ, উ ইত্যাদি। আর একাধিক বর্ণের প্রত্যয়গুলি হল—ক্তি, ঘঞ, আন্ত, ষ্ণেয়, ষ্ণায়ন ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা ভাষায় নিজস্ব প্রত্যয় তো আছেই। তা ছাড়াও আছে সংস্কৃত প্রত্যয় ও বিদেশি প্রত্যয়। আমরা এখানে বাংলা প্রত্যয় নিয়েই আলোচনা করব। যাই হোক প্রত্যয়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

১. কৃৎ প্রত্যয় (Primary Affixex)

২. তদ্ধিত প্রত্যয় (Secondary Affixes)

কৃৎ প্রত্যয় :

ধাতু প্রকৃতি বা ধাতুর সঙ্গে যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে বলে কৃৎ প্রত্যয়। যেমন—

√চল + অন্ত (প্রত্যয়) = চলন্ত

√গম + অন (প্রত্যয়) = গমন

এখানে√

চল ও √ গম ধাতু। আর অন্ত হল প্রত্যয়। নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে চলন্ত ও গমন। কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলিই হইল কৃদন্ত শব্দ। কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ হলে তাকে বলা হয় কৃদন্ত বিশেষণ। দেখ গেছে সংস্কৃত ভাষার কৃৎ প্রত্যয়গুলি সংক্ষিপ্ত, কখনও পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃত প্রত্যয় হয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে। তবে ব্যবহারগত দিক থেকে বাংলায় কৃৎ প্রত্যয়ের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। বাংলা কৃৎ প্রত্যয়ের সংখ্যা ২৩। এবার সেগুলি আলোচনা করা হল—

১. অ—(উচ্চারণের অলোপ পায় এবং ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠিত হয়।)

√ ঝুল্ + অ = ঝুল

√ ঘির্ + অ = ঘের ইত্যাদি।

২. আ—(বিশেষ্য, বিশেষণ দু'ধরনের শব্দই গঠন করে।)

√ চল্ + আ = চলা

√ খাঁ + আ = খাওয়া প্রভৃতি।

৩. আই—(বিশেষ্য পদে এই প্রত্যয় থাকে।)

√ বাঁধ্ + আই = বাঁধাই

√ খা + আ = খাওয়া প্রভৃতি।

৪. আও—(বিশেষ্য পদে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।)

√ ফল্ + আও = ফলাও

√ ঘির্ + আও = ঘেরাও প্রভৃতি।

৫. ই—(প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য হয়।)

√ হাঁচ্ + ই = হাঁচি

√ ফির্ + ই = ফিরি প্রভৃতি।

৬. ইয়ে—(দক্ষ অর্থে এই প্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়।)

√ নাচ্ + ইয়ে = নাচিয়ে

√ বাজ্ + ইয়ে = বাজিয়ে প্রভৃতি।

৭. আরী—(দক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

√ ডুব্ + আরী = ডুবারী (ডুবুরি)

√ পূজা + আরী = পূজারী ইত্যাদি।

৮. ইয়া—(ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

√ খেল্ + ইয়া = খেলিয়া

√ দেখ্ + ইয়া = দেখিয়া প্রভৃতি।

৯. এন—(দক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

√ গান্ + এন = গায়েন

√ বায়্ + এন = বায়েই ইত্যাদি।

১০. অন—(ভাব ও করণবাচ্যে ব্যবহৃত হয়।)

√ কাঁদ্ + অন = কাঁদন

√ বাঁচ্ + অন = বাঁচন প্রভৃতি।

১১. অনা—('অ' লোপ পেয়ে 'না' থাকে)

√ রাধ্ + অনা = রাঁধন

√ ঝর্ + অনা = ঝরনা ইত্যাদি।

১২. আনি—(সব বাচ্যেই এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।)

√ ঝাঁক্ + আনি = ঝাঁকানি

√ পার্ + আনি = পারানি প্রভৃতি।

১৩. আন (আনো)—(বিভিন্ন বাচ্যে ব্যবহৃত হয়।)

√ জানা + আন = জাজান (জানানো)

√ হাতা + আন = হাতান (হাতানো) ইত্যাদি।

১৪. অন্ত—(ঘটমান বর্তমান কালে ব্যবহৃত হয়।)

√ জীব্ + অন্ত = জীবন্ত

√ পড়্ + অন্ত = পড়ন্ত প্রভৃতি।

১৫. অনি (উনি)—(ক্রিয়ার ভাব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।)

√ গাঁথ্ + উনি = গাঁথুনি

√ কাঁদ্ + উনি = কাঁদুনি ইত্যাদি।

১৬. অত—(ঘটমান অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

√ ফির্ + অতি = ফিরতি

√ জান্ + অতি = জানতি প্রভৃতি।

১৭. উক—(কর্তৃ বাচ্যে ব্যবহৃত হয়।)

√ বুঝ্ + উক = বুঝুক

√ দেখ্ + উক = দেখুক ইত্যাদি।

১৮. ইব—(ক্রিয়া বা ভাববাচক বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

√ দেখ্ + ইব = দেখিব

√ চল্ + ইব = চলিব প্রভৃতি।

১৯. উয়া—(অবস্থা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।)

√ পড়্ + উয়া = পড়ুয়া

√ উড়্ + উয়া = উড়ুয়া (উড়ো) ইত্যাদি।

২০. তি—(এই প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ হয়।)

√ চল্ + তি = চলতি

√ ঘাট্ + তি = ঘাটতি প্রভৃতি।

২১. তা—(বিভিন্ন বাচ্যে এই প্রত্যয় হয়।)

√ ধর্ + তা = ধরতা

√ পড়্ + তা = পড়তা ইত্যাদি।

২২. ইবা—(ক্রিয়া বা ভাববাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

√ পর্ + ইবা = পরবা

√ ধর্ + ইবা = ধরবা প্রভৃতি।

২৩. ই—(ভাব বাচ্যে প্রয়োগ করা হয়।)

√ দেখ্ + ই = দেখি

√ চল্ + ই = চলি ইত্যাদি।

২৪. উ—(বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

√ হাঁট্ + উ = হাঁটু

√ ঘেট্ + উ = ঘেটু ইত্যাদি।

২৫. অক—('ক' থাকে 'অ' লোপ পায়।)

√ চড়্ + অক = চড়ক

√ চট্ + অক = চটক ইত্যাদি।

২৬. ইয়ে—(কর্তৃ বাচ্যে ব্যবহৃত হয়।)

√ কর্ + ইয়ে = করিয়ে

√ খেল্ + ইয়ে = খেলিয়ে ইত্যাদি।

২৭. ইলে—(বিশিষ্টার্থক ভাবে ব্যবহৃত হয়।)

√ নাচ্ + ইলে = নাচলে

√ কর্ + ইলে = করিলে ইত্যাদি।

২৮. ইতে—(অভিপ্রায় অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

√ চল্ + ইতে = চলিতে

√ বল্ + ইতে = বলিতে প্রভৃতি।

তদ্ধিত প্রত্যয় : শব্দ প্রকৃতি বা শব্দের সঙ্গে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হলে তাকে বলে তদ্ধিত প্রত্যয়। যেমন—

মোগল্ + আই = মোগলাই

বসন্ত্ + ঈ = বাসন্তী

এখানে মোগল আর বসন্ত হল দুটি শব্দ। এর সঙ্গে 'আই' এবং 'ঈ' প্রত্যয় দুটি যুক্ত হয়ে হয়েছে মোগলাই বা বাসন্তী। এবারে বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে শব্দগুলি লেখা হল।

১. আ—(অস্তিত্ব, জাত, স্বভাব, সাদৃশ্য প্রভৃতি অর্থে গৃহীত।)

চাল্ + আ = চালা

হাত্ + তা = হাতা ইত্যাদি।

২. আই—(ভাবার্থে, আদরে ব্যবহৃত হয়।)

চিকন্ + আই = চিকনাই

কান্ + আই = কানাই প্রভৃতি।

৩. আরী আর—(বৃত্তি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।)

ভিখ্ + আরী = ভিখারী

কর্ম্ + আর = কামার ইত্যাদি।

৪. ই—(বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়।)

ঢাক্ + ই = ঢাকাই

শয়তান্ + ই = শয়তান প্রভৃতি।

৫. ঈ—(বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

ঢাক্ + ঈ = ঢাকী

ধ্রুপদ + ঈ = ধ্রুপদী প্রভৃতি।

৬. ইয়া—(বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

পাথর্ + ইয়া = পাথরিয়া > পাথুরে

আদর্ + ইয়া = আদরিয়া > আদুরে ইত্যাদি।

৭. উয়া—(বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

মাছ্ + উয়া = মাছুয়া > মেছে

ভাত্ + উয়া = ভাতুয়া > ভেতে প্রভৃতি।

৮. আমি, আম—(ভাব, অনুকরণ অর্থে)

বোকা + আমি = বোকামি

পাগল্ + আম (আমো) = পাগলামো ইত্যাদি।

৯. আল, আলো, আলি—(বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

দাঁত্ + আল = দাঁতাল

শাঁস্ + আলো = শাঁসালো প্রভৃতি।

১০. উক—(স্বভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

নিন্দা + উক = নিন্দুক

লাজ্ + উক = লাজুক ইত্যাদি।

১১. উ—(আদরে, স্বার্থে ব্যবহৃত।)

খুক + উ = খুকি

ভীত্ + উ = ভীতু প্রভৃতি।

১২. ওয়ালা—(বৃত্তি বা ব্যবসা অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

রিকশা + ওয়ালা = রিকশাওয়ালা

কাবুল + ওয়ালা = কাবুলিওয়ালা ইত্যাদি।

১৩. ওয়ান—(বৃত্তি অর্থে ব্যবহার করা হয়।)

গাড়ি + ওয়ান = গাড়োয়ান

দার্ + ওয়ান = দারোয়ান প্রভৃতি।

১৪. লা, লি, ল—(আছে বা সাদৃশ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

আধ্ + লা = আধলা

হাঁস + লি = হাঁসলি (হাঁসুলি) ইত্যাদি।

১৫. ড়া, ড়ি, ড়ে—(স্বার্থ বা সাদৃশ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

গাছ্ + ড়া = গাছড়া

আঁক + ড়ি = আঁকাড়ি প্রভৃতি।

১৬. সা—(সাদৃশ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

ঝাপ্ + সা = ঝাপসা

ভাপ্ + সা = ভাপসা ইত্যাদি।

১৭. আরু—(সূক্ষ্ম অর্থে ব্যবহার হয়।)

বোমা + আরু = বোমারু

দিশ্ + আরু = দিশারু প্রভৃতি।

১৮. টিয়া (টে)—(স্বভাব বা আছে অর্থে ব্যবহার হয়।)

তামা + টিয়া = তামাটিয়া > তামাটে

ভাড়া + টিয়া = ভাড়াটিয়া > ভাড়াটে ইত্যাদি।

১৯. মন্ত, বন্ত—(আছে অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

পয়্ + মন্ত = পয়মন্ত

শ্রী + মন্ত = শ্রীমন্ত প্রভৃতি।

২০. পনা—(আচরণ বা ভাব বোঝাতে ব্যবহার হয়।)

গিন্নি + পনা = গিন্নিপনা

দুরন্ত + পনা = দুরন্তপনা ইত্যাদি।

২১. ট—(স্বার্থ বা স্বভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

জমা + ট = জমাট

ভরা + ট = ভরাট প্রভৃতি।

২২. উড়িয়া (উড়ে)—(স্বভাব, সম্বন্ধ, ব্যবসা অর্থে ব্যবহার হয়।)

সাপ্ + উড়িয়া = সাপড়িয়া > সাপুড়ে

ভুত্ + উড়িয়া = ভূতুরিয়া > ভূতুড়ে ইত্যাদি

২৩. চী—(ধরে যে অর্থে ব্যবহার হয়।)

তবল্ + চী = তবলচী

কমল্ + চী = কমলচী প্রভৃতি।

২৪. ত, তি—(পাত্র জাতীয় বস্তু বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।)

বাল্ + তি = বালতি

চাক্ + তি = চাকতি ইত্যাদি।

২৫. পানা, পারা—(সাদৃশ্য বোঝাতে ব্যবহার হয়।)

পাগল্ + পারা = পাগলপারা

রোগা + পানা = রোগাপানা ইত্যাদি।

৩.৩.১০.৪ অনুসর্গ

ভাব প্রকাশের বিকল্প হিসেবে অনুসর্গ ব্যবহৃত হতে থাকে। এক সময় শুধু নামবাচক অনুসর্গ ব্যবহৃত হত, এখন নামবাচক অনুসর্গের পাশাপাশি ভাববাচক অনুসর্গ ব্যবহৃত হচ্ছে।

অনুসর্গকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

নামবাচক অনুসর্গ : এই ধরনের অনুসর্গ বিবর্তিত হয়ে প্রত্যয় অনুসর্গের রূপ পেয়েছে। বৈদিক স্তরে এই ধরনের অনুসর্গ ব্যাপক ভাবে প্রচার পেয়েছিল এবং ভাষায়ও খুবই ব্যবহৃত হত। এখনও অবশ্য নাম অনুসর্গের ব্যাপক ব্যবহার আছে। যেমন—নিমিত্ত, তরে, মিনা, প্রতি, সহিত, বদলে। বরাবর ইত্যাদি এই অনুসর্গের উদাহরণ। নাম অনুসর্গকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সেগুলি হল—তৎসম অনুসর্গ, তদ্ভব অনুসর্গ, অর্ধ-তৎসম অনুসর্গ ও বিদেশি অনুসর্গ। এবারে এই অনুসর্গগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল।

তৎসম অনুসর্গ : সংস্কৃত থেকে অনেক অনুসর্গ বাংলা ভাষায় এসে বাংলাকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন—অন্তরে, উপর, দিশে, সহিত, প্রতি ইত্যাদি।

ক. তার **প্রতি** আমার কোনও রাগ নেই।

খ. রাস্তার **উপর** দাঁড়িয়ে থেকো না।

গ. সে কোন **দিশে** যে গেল তা আমার জানা নেই।

তদ্ভব অনুসর্গ : এই ধরনের অনুসর্গ সংস্কৃত থেকে এসে বাংলায় নিজ স্বরূপ নিয়েছে। সাধারণত পানে (ভিতর), অভিমুখ (কাছে বা সম্মুখে), ব্যতীত (বই), অগ্র (আগ) ইত্যাদি এখানে ব্যবহৃত হয়।

ক. এই অবস্থার পরে তার পানে আর চাইতে পারলুম না।

খ. পঙ্কজের অভিমুখ কী জানা আছে?

গ. সে ব্যতীত আমার কোনও মূল্যই নেই।

অর্ধ-তৎসম অনুসর্গ : এই ধরনের অনুসর্গে কিছুটা দেশি প্রভাব আছে, কিছুটা সংস্কৃত প্রভাব আছে। যেমন—আন্তর (জন্য), পর (উপর), বিনা (সমীপে) ইত্যাদি বাক্য মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

ক. তুমি **বিনা** আমি মূল্যহীন।

খ. ভগবানের **পর** আস্থা হারানো পাপ।

গ. তোমার **আন্তর** লাগি আমার হৃদয় কাঁদছে।

বিদেশি অনুসর্গ : বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিদেশি ভাষা থেকে অনেক শব্দ এসেছে। তার মধ্যে কিছু অনুসর্গও আছে। মূলত আরবি, ফারসি থেকেই এইসব অনুসর্গ বাংলা ভাষায় এসেছে। যেমন—বাধ, বরাবর, হুজুর, তরে, বাবদ, বদল ইত্যাদি অনুসর্গ।

ক. কিসের **তরে** এই ক্রন্দন জানতে পারি কি?

খ. বাড়ি কেনা **বাবদ** অমলবাবুর এগারো লক্ষ খরচ হল।

গ. এই রাস্তা ধরে **বরাবর** এগিয়ে যাও।

ভাববাচক অনুসর্গ : এই ধরনের অনুসর্গে সাধারণত ব্যবহৃত হয়—থাক, ধর, বল, ভর, হতে লহ, লাগ ইত্যাদি শব্দ।

ক. তুমি **থাক** এখানে, আমি বাড়ি যাচ্ছি।

খ. আজি **থেকে** আমি হলাম তোর সাথী।

গ. আমি আর তুমি এক হলাম **বলেই** তো ঝগড়া মিটল।

আশ্রিত অনুসর্গ : এই ধরনের অনুসর্গ নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ অনুসর্গ সুলভ প্রত্যয়। নাম শব্দের রূপ, গুণ, প্রকৃতি ও তাদের অর্থ বুঝিয়ে দেয়। অনেকে এই ধরনের অনুসর্গকে নির্দেশক অনুসর্গ বলেও ব্যাখ্যা করেছেন। টি, টা, খানা, খানি, টুকু, গাছি ইত্যাদি হল এই ধরনের অনুসর্গের উদাহরণ। এই ধরনের অনুসর্গ শব্দের আশ্রিত থাকে বলে একে আশ্রিত অনুসর্গ বলা হয়।

ক. এই **গাছটা** থেকে ফলগুলো পাড়।

খ. **সরবতটুকু** খেয়ে নাও সোনা।

গ. **একগাছি** চুড়ি পরিয়ে দিলাম বন্ধুকে।

কারকবাচক অনুসর্গ : এই ধরনের অনুসর্গ সাধারণত বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত হয়। যেমন—অপাদানে হইতে, থেকে, চেয়ে ইত্যাদি। নিমিত্ততে অন্তরে, জন্যে, লাগিয়া ইত্যাদি, আবার কারণে দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার বাংলা ভাষায় লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু এইসব অনুসর্গ কারকের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই এগুলিকে বলা হয় কারকবাচক অনুসর্গ।

ক. আমার **দ্বারা** এ কাজ হবে না।

খ. তোমার **জন্য** আমি চাকরিও ছাড়তে পারি।

গ. আজ **থেকে** আবার নতুন করে কাজ শুরু করব।

সংখ্যাবাচক অনুসর্গ : অনেকে এই ধরনের অনুসর্গকে নামবাচক অনুসর্গ রূপে চিহ্নিত করেছেন। আবার অনেকে বলেছেন এটি প্রত্যয় অনুসর্গ। যাই হোক, এই ধরনের অনুসর্গের সঙ্গে সংখ্যা শব্দের একটি যোগ আছে তাই একে বলা হয় সংখ্যাবাচক অনুসর্গ। যেমন—সুধীজন, পাঁচজনে, এক সঙ্গে ইত্যাদি।

ক. উত্তরপাড়ার উন্নতিতে সুধীজনের একটা ভূমিকা আছে।

খ. পাঁচজনে ধরে নিয়ে গেল চোরটাকে।

গ. সবাই একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই ঠিক।

৩.৩.১০.৫ বিভক্তি

বিভক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—বাক্যস্থিত বিশেষ্যের বিশেষ বিশেষ কারক নির্দিষ্ট যে পদাংশ বা পদযোগ তাকেই বলে বিভক্তি। সাধারণ ভাবে বিভক্তিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। তাহল—

১. শব্দ বিভক্তি (Declension Inflexions) :

২. ক্রিয়া-বিভক্তি (Verbal Inflexions) :

দেখা গেছে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচন ও কারকের রূপ প্রকাশিত হয় শব্দ বিভক্তি যোগে। অর্থাৎ এই বিভক্তি বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে এই বিভক্তি বাংলায় এসেছে। এই বিভক্তির একটি নাম হল সুপ। তাই এই বিভক্তি দ্বারা গঠিত সর্বনাম বা বিশেষ্য পদকে বলা হয় সুবন্ত (সুপ + অন্ত) পদ। যেমন—সূর্যের, ঘরে, মামারা ইত্যাদি। এইসব বিশেষ্য বা সর্বনামে এর, রা, এ ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

ক্রিয়াপদের রূপ প্রকাশিত হয় ক্রিয়া বিভক্তি যোগে। অর্থাৎ ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হয় যে বিভক্তি তাকে বলে ক্রিয়া বিভক্তি। প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণে এই বিভক্তির একটি নাম ছিল তিঙ্। এই বিভক্তি দ্বারা গঠিত ক্রিয়াপদকে বলা হয় তিঙন্ত (তিন + অন্ত) পদ। যেমন—বলে, করিয়া, করেই ইত্যাদি।

উৎসগত দিক থেকে বাংলা ভাষার বিভক্তিকে আবার দু'ভাবে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—'ক', 'ত', 'র'। এছাড়াও বাংলা ভাষায় আর একটি বিভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যাকে বলে 'শূন্য' বিভক্তি। সুতরাং বাংলা ভাষায় মোট বিভক্তির সংখ্যা পাঁচটি। যেমন—এ, ক, ত, র, শূন্য। সম্বন্ধ পদসহ বাংলা কারকে এই পাঁচটি বিভক্তির সম্পর্ক রয়েছে। এবারে এই পাঁচটি বিভক্তি আলাদা আলাদা করে আলোচনা করা হল—

শূন্য বিভক্তি বিশেষ্যে বিভক্তি না থাকলে তাকে বলে শূন্য বিভক্তি। এক কথায় বিভক্তি না থাকলে তাকে বলা হয় শূন্য বিভক্তি। শুধু কর্তৃকারকেই নয়, সব কারকেই শূন্য বিভক্তি হয়। কর্ম, করণ, অধিকরণ, অপাদান, সম্প্রদান যে কারকই হোক না কেন, শূন্য বিভক্তি যে কোনও কারকেই হতে পারে। বাংলা ভাষায় সব স্তরেই শূন্য বিভক্তির পরিচয় আছে। যেমন—

ক. **বংশীবাবু** বাঁশি বাজায়।

খ. **মৌমিতা** কল্যাণীতে পিএইচ.ডি করছে।

এখানে 'বংশীবাবু', 'মৌমিতা' এই দুটি বিশেষ্য পদে কোনও পদাণু বা বিভক্তি যুক্ত হয়নি। সাধারণত এখানে ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্যের সম্পর্ক বোঝাতে কোনও পদাণুর দরকার পড়েনি। তাই এখানে শূন্য বিভক্তি হয়েছে। কর্তৃকারক ছাড়াও কর্মকারক, অধিকরণকারকে শূন্য বিভক্তি হয়। এছাড়া করণকারক, অপাদানকারকেও বিভক্তিহীন দেখা যায়।

'র' বিভক্তি : এই বিভক্তি অনুসর্গ থেকে জাত। উল্লেখ্য 'ক', 'ত' বিভক্তি ও অনুসর্গ জাত বিভক্তি। অনেকে বলেছেন 'ক' থেকে 'র' বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে, রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ—

কার্য > কাইরকের > এর > র

বাংলা ভাষার ক্রম বিবর্তনে অর্থাৎ প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক, বাংলাতে ‘র’ বিভক্তির প্রয়োগ হয়ে চলেছে। যেমন আধুনিক বাংলায়—

ক. **প্রসূনের** বাড়ি আজ যাব না।

খ. **বাঘের** কামড়ে দিলু বাবু মারা গেছেন।

এখানে ‘প্রসূনের’, ‘বাঘের’ এই দুটি পদে ‘র’ বা ‘এর’ বিভক্তি যুক্ত রয়েছে। এখানে ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্যের সম্পর্ক গড়ের ‘র’ বা ‘এর’ বিভক্তি। সম্বন্ধ পদে সাধারণত এই বিভক্তি যুক্ত হয়।

‘ত’ বিভক্তি : এই বিভক্তিটিও অনুসর্গ থেকে জাত। এই বিভক্তির উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে যেমন—

অন্তঃ > তঁ > ত

আবার সুকুমার সেন এর উৎস সম্পর্কে বলেছেন—

ত্র > ত্ত > ত অর্থাৎ ‘ত্র’ থেকেই রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে ‘ত’ বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালে ‘ত’ বিভক্তির বৈচিত্র হয়েছে ‘তে’ ‘এতে’। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—

ক. সুলেখা অর্থনীতিতে ফেল করেছে।

খ. আমরা ভারতে বসবাস করি।

এখানে ‘অর্থনীতিতে’ ও ‘ভারতে’ পদে ‘ত’ (তে) বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। এই বিভক্তি মূলত অধিকরণ কারকের। তা ছাড়াও কর্তৃকারক, করণকারক ইত্যাদিতে ‘ত’ বিভক্তির প্রয়োগ হয়।

‘ক’ বিভক্তি : ‘র’ বা ‘ত’ বিভক্তির মতো ‘ক’ বিভক্তিও অনুসর্গজাত। এই বিভক্তির উৎস সম্পর্কে বলা যায়—

কৃতঃ > কএ > এই > কি > ক

আবার সুকুমার সেন এর উৎস সম্পর্কে বলেছেন—

আদি প্রাকৃত ক্য > ক্ক > নব্যভারতীয়তে ‘ক’

যাই হোক এই বিভক্তি সম্প্রসারিত রূপ ‘কার’, ‘কের’ ইত্যাদি। এর উদাহরণ—

ক. **তোমাকে** এখনই বাড়ি যেতে হবে।

খ. **আমাকে** বলতে দাও এসব কথা।

উপরের বাক্যে ‘তোমাকে’ ও ‘আমাকে’ পদে ক (ক) বিভক্তি যুক্ত হয়ে রয়েছে। এই বিভক্তি সাধারণ কর্মকারক ও সম্প্রদানকারকে হয়ে থাকে।

‘এ’ বিভক্তি : ‘এ’ বিভক্তিকে বলা হয় বিভক্তিজাত বিভক্তি। ‘এ’ বিভক্তি দ্বারা সাধারণত ক্রিয়াপদের রূপ প্রকাশিত হয়। অনেকে আবার এই বিভক্তিকে বলেছেন তির্যক বিভক্তি। এই বিভক্তিই অন্যান্য বিভক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ সব কারকেই এই বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়। শুধু আধুনিক বাংলা নয়, প্রাচীন বা মধ্য বাংলাতে ‘এ’ বিভক্তির জয়জয়কার ছিল। যেমন—

ক. **ছাগলে** ঘাস খায়।

খ. **লোকমুখে** আমি এইসব শুনেছি।

এখানে 'ছাগলে' ও 'লোকমুখে' পদে 'এ' বিভক্তি যুক্ত রয়েছে। কর্তৃকারক, কর্মকারক এই রকম সব কারকেই 'এ' বিভক্তির জয়জয়কার।

৩.৩.১০.৬ সহায়ক গ্রন্থ

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে'

৩.৩.১০.৭ আদর্শ প্রশ্নমালা

বিশেষ্য বলকে কী বোঝ? শ্রেণীবিভাগ করে বিশেষ্যের স্বরূপ বুঝিয়ে দাও।

পর্যায় গ্রন্থ-৩

একক -১১
চমস্কির সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ (সাধারণ ধারণা)

বিন্যাস ক্রম :

৩.৩.১১.১ : চমস্কির সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ (সাধারণ ধারণা)

৩.৩.১১.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.৩.১১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.৩.১১.১ : চমস্কির সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ (সাধারণ ধারণা) :

ভাষা বিজ্ঞান চর্চার সবচেয়ে আধুনিকতম ধারা। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পৃথিবীজুড়ে গঠন বাদী ব্যাকরণের ধারা চলছিল। এইমতের বিরোধিতা করেছিলেন স্যার আব্রাহামন নোর্যাম চমস্কি। এই হিসেবে তার 'Syntactic Structures' (1957) গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি বলেছেন ভাষার সৃজনী ক্ষমতার কথা। সাংগঠনিক ব্যাকরণের যান্ত্রিকতাকে উপেক্ষা করে ভাষার সৃজনীদিক নিয়ে আলোচনা তাঁর বইয়েই প্রথম দেখা গেল। আগে অবশ্য হুমবোল্ট বলেছিলেন যে, ভাষা নির্দিষ্ট সংখ্যক উপাদানের মাধ্যমে অজস্র বাক্যগঠন করতে পারে। অর্থাৎ তিনিও ভাষার সৃজনীদিকের কথাই বলেছিলেন। কিন্তু চমস্কি এই তত্ত্বটি প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন। সারা পৃথিবীতে বর্তমানে চমস্কি আবিষ্কৃত ভাষার সৃজনী দিক নিয়েই আলোচনা চলছে।

এই ধরনের ব্যাকরণে গুরুত্ব পেয়েছে ভাষার সক্রিয়তা। ফলে এই ব্যাকরণে অনেকটা নক্সার মতো অনুক্রম তৈরি করে। সেটা অবশ্যই বিশুদ্ধ, বাস্তব, স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ব্যাকরণ কোনও বিষয়কে ব্যাখ্যা করে আরোহী প্রথার সাহায্যে। ভাষার সংজ্ঞায় চমস্কি বলেছেন—

> "A language to be a set (Finite or infinite) of sentences, each finite in length and constructed out of a finite set of elements."

চমস্কির এই সংজ্ঞা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্ব ছাড়াও দর্শন,

পরিসংখ্যান ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আর ব্যাকরণ বলতে বুঝিয়েছেন—

> "It must generate (i,e specify how to form, interprete and pronounce) all and only well fromed sentences of longuage."

চমস্কির ব্যাকরণ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি নিভাষার ব্যাকরণ গত কাঠামো ও সেই ভাষার উপাদান নির্মিতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্যাবলী :

১. এই ব্যাকরণে সৃষ্ট বাক্য, শুদ্ধ বাক্যরূপে পরিচিত। কারণ ভাষার সমস্ত নিয়ম আবিষ্কারের দিকেই এই ব্যাকরণের গতিশীলতা। চার্লস এফ.হকেট এই ব্যাকরণকে বলেছেন "Items and Process Grammar" 'A Grammar of Rules'।

২. চমস্কির এই ব্যাকরণে 'Generative' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি ব্যাবহার করেছেন 'Trans formational' শব্দটিও। যার অর্থ রূপান্তরমূলক এবং প্রথমটির অর্থ সৃজনমূলক। অর্থাৎ তিনি যেমন ভাষার রূপান্তরে বিশ্বাসী তেমনি সৃজনশীলতায়ও। এর মধ্যে দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ব্যাকরণের ভবিষ্যদ্বাণীর সক্ষমতা। এবং তার সঙ্গে থাকবে ব্যাকরণের সুস্পষ্টতা।

৩. এই ব্যাকরণের সূত্রাবলী নির্ভুল বাক্য গঠন করতে সাহায্য করে, তবে উৎপাদন (Produce) নয়। অর্থাৎ বাক্য সৃজনকে তিনি Creativity -এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

৪. রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণের আগে সাংগঠনিক ব্যাকরণের ধারাটা ভীষণ ভাবে প্রাচলিত ছিল মার্কিনদেশে। চমস্কির ব্যাকরণ বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনাদিতেও সক্ষম।

৫. এই ধরনের ব্যাকরণ অল্প সূত্রের মাধ্যমে অসংখ্য বাক্যসৃষ্টি করতে সক্ষম। এখানে জেনেরা খাভালো যদি ব্যাকরণের সূত্রসংখ্যা অসংখ্য হত তাহলে অজস্র বাক্য তৈরি করা যেত না।

৬. এটি পৃথিবীর সকল শ্রেণির মানুষের বা ভাষার ব্যাকরণ। বক্তা শ্রোতা উভয়ই এই ব্যাকরণের সূত্র প্রয়োগ করে পরস্পরের কথা বুঝতে পারে। যান্ত্রিকতাকে কে এই ব্যাকরণ মুক্ত বলেই এটি মানুষের বোধির উপর নির্ভর শীল।

সঞ্জননীতত্ত্বের মূলকথা সৃজনে। বাক্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে বলা যায় নিত্য নতুন বাক্য সৃষ্টি করা। মানুষ প্রতিনিয়তই ভাষা শিখছে, তা ব্যবহারও করছে। কখনওই কিন্তু একই বাক্য আমরা বার বার বলি না। প্রতিনিয়তই নিত্য নতুন বাক্য বলি বা লিখে থাকি। চমস্কির ভাষায় এটি বাক্যসঞ্জনন (Sentences Generation)। চমস্কির মতে সৃষ্ট বাক্যের গঠনগত শ্রেণি দুই রকমের, তা আদর্শ গঠন ও প্রকৃত গঠন। ভাষার আন্বয়িক কাঠামো ভাষার অন্তর্নিহিত ব্যাকরণের কাঠামোর উপর নির্মিত, একথা তিনি বলেছেন। অন্তর্নিহিত কাঠামো তাঁর মতে অধোগঠন আর উচ্চারিত বাক্যগুলি অধিগঠন। অর্থাৎ অধোগঠন থেকে অধিগঠনের যাওয়ার সময় যে সবপরিবর্তন ঘটে তাকেই-বলেছেন সংবর্তন বা রূপান্তর (Transformational) । বাক্য বা ভাষার এই রূপান্তর ও সৃজন মিলেই তার ব্যাকরণ রূপান্তর ও সৃজনমূলক ব্যাকরণ (Transformational Generative Grammar) ।

এই ব্যাকরণে চমস্কি বলেছেন ভাষা কোনও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। এটি একটি সৃজন প্রক্রিয়া। অর্থাৎ প্রথমেই তিনি সাংগঠনিক ব্যাকরণের বিরোধিতা করেছেন। 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

> 'One of the qualities that all languages have in common is their creative aspest. The grammar of a particular language, then is to be supplements by a universal grmmar that accommodates the creative aspect of language use."

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তার 'কথোপকথন' গ্রন্থে শব্দের সঙ্গে প্রকাশিত ভাব বা অর্থের সম্পর্কে স্বীকার করেছিলেন। চমস্কিও Creativity ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষার সঙ্গে মনের অবধারিত সম্পর্কেও গুরুত্ব দিলেন। তাই চমস্কি তত্ত্বকে অনেকেই বলে থাকেন মনস্তত্ত্ব প্রধানতত্ত্ব (Mentalist Theory)।

আমার জানি মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের কথা বলে। বেঁচে থাকা ও পথ চলার তাগিদে মানুষকে নিত্য নতুন বাক্য প্রয়োগ করতে হয়। সব বাক্যই কিন্তু তার মা, বাবা বা প্রতিবেশীর কাছে শেখা নয়। তা ছাড়া ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি জেনেও কখনও আগাম বাক্য প্রস্তুত করে রাখা সম্ভব নয়। মানুষের মনও টেপরেকর্ডারের মতো নয়, যা রেকর্ড করা থাকবে বা তাকেই বলতে হবে। অন্য দিক থেকে বলা যায় মানুষের মনটাও কম্পিউটার নয় যে প্রোগ্রাম অনুযায়ী কম্পিউটার থেকে ফলাফল বেরিয়ে আসবে। মানুষ প্রথমে ভাষার মূল নীতি নিজের বোধ বা জ্ঞানের সাহায্যে আয়ত্ত করে, তার পরে ভাষা ক্ষমতা দিয়ে নিত্য নতুন বাক্য সৃষ্টি করে। ভাষা সৃষ্টি কাজটি হল হয় সূত্রের মাধ্যমে বা রূপান্তর প্রক্রিয়ায়। চমস্কি ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে যেসব বই লিখেছেন, তাঁর কয়েকটি হল—

১. Syntactic Structures (1957)

২. Current issues in Linguistics Theory (1964)

৩. Aspects of the Theory of Syntax (1965)

৪. Topic in the Theory of Generative Grammar (1966)

৫. Language and Mind (1976)

৬. Reflection on Language (1976)

সব বইতে তিনি রূপান্তরমূলক-সৃজনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাষার বিশ্লেষণ করেছেন। কোনও একটা নির্দিষ্ট ভাষা নয়, পৃথিবীর সব ভাষার বিশ্লেষণ চমস্কির রচিত ব্যাকরণের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

৩.৩.১১.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।

৩.৩.১১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. স্যার আব্রাহাম নোয়াম চমস্কির রূপান্তরমূকল সৃজনমূলক ব্যাকরণ বলতেকী বোঝ? এই ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্যাবলী নিরূপণ করো।

পর্যায় গ্রন্থ-৩

একক -১২

বেতার-টিভি, সংবাদপত্রের ও বাংলা বিজ্ঞাপনেব ভাষা

বিন্যাস ক্রম :

৩.৩.১২.১	:	বেতারের ভাষা
৩.৩.১২.২	:	টিভির ভাষা
৩.৩.১২.৩	:	সংবাদপত্রের ভাষা
৩.৩.১২.৪	:	বাংল বিজ্ঞাপনের ভাষা
৩.৩.১২.৫	:	সহায়ক গ্রন্থাবলী
৩.৩.১২.৬	:	আদর্শ প্রশ্নবলী

৩.৩.১২.১ : বেতারের ভাষা :

এই ভাষা শুধু মাত্রশ্রুতি গ্রাহ্য। এই ভাষা পত্র পত্রিকার বিজ্ঞাপনী ভাষার মতো হয়েও অনেকটাই আলাদা। কারণ বিষয়টাকে শ্রুতিমধুর না করলে শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয় হবে না। তাই শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার আরও সাবলীল ও বোধগম্য করা হয়। পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপন পাঠক একাধিক বার অনেক সময় ধরে দেখে এবং বুঝতে পারে কিন্তু বেতারে তার অবকাশ একদমই নেই। তাই অল্প সময়ে ছন্দের দোলায় ভাষাকে শ্রুতিমধুর করা হয়।

৩.৩.১২.২ : টিভির ভাষা :

সংবাদপত্র বা বেতার থেকে ও এই গণমাধ্যমটির আবেদন বেশি। কারণ একই সঙ্গে এটি শ্রুতিগ্রাহ্য ও দৃষ্টিগ্রাহ্য। এর ভাষা কোলাজধর্মী। দর্শক, শ্রোতা একই সঙ্গে বিজ্ঞাপনের বিষয় শোনে, দেখে। তাই 'সিনেমাটিক ট্রিটমেন্ট'—এ এই ভাষাকে নাটকীয় করা হয়। কখনও সুর, কখনও কাব্যিকতা এই ভাষায় শোভা পায়। তাই পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন দূরদর্শনের পর্দায় আকর্ষীণয়।

৩.৩.১২.৩ : সংবাদপত্রের ভাষা :

সংবাদপত্রেও শিল্পসৃজন হয়। কারণ ধারাবাহিক উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি এখানে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই গল্প বা উপন্যাসের ভাষার সঙ্গে দৈনন্দিন সংবাদপত্রের ভাষা অনেকটাই আলাদা। বিখ্যাত বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার সংবাদ উপস্থাপন আলাদা হলেও সব সংবাদপত্রেরই একটি নির্দিষ্ট ভাষা আছে। সেটার সঙ্গে কথ্য বা মৌখিক ভাষার যথেষ্ট মিল আছে। এ ছাড়া সংবাদপত্রের ভাষাকে সাধারণত ফিচারধর্মী ভাষাও বলা হয়।

সংবাদপত্রের ভাষা আসলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাক্ষর-নিরক্ষর, জ্ঞানী-মূর্খ সকলের উপযোগী ভাষা। এখানে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত কথোপকথনের মৌখিক রূপই তুলে ধরা হয়।

সংবাদপত্রের সাংবাদিক বা লেখকেরা সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় সংবাদ বা বিষয়কে উপস্থাপন করেন। এখানে শব্দ ব্যবহারের একটা সুচিন্তিত নির্দেশ আছে। জটিল বা কঠিন শব্দ এখানে একদম ব্যবহার করা হয় না। সমাসবদ্ধ পদ বা কঠিন তৎসম শব্দের ব্যবহার একদমই নিষিদ্ধ। পরিবর্তে লৌকিক আটপৌরে শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়।

কাবিকতা বা নাটকীয় ভাষার কোনও স্থান নেই এখানে। একটি শব্দের একটিই অর্থ আছে এইরকম শব্দের ব্যবহারই সংবাদপত্রে বেশি হয়। পাঠকদের কথা ভেবেই সাধারণত সাংবাদিকরা এই বিষয়টি করে থাকেন।

যে ভাষায় সংবাদপত্র ছাপা হয় সেই ভাষাভাষী মানুষের আবেগ, উদ্দীপনা, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই ভাষাভাষী মানুষের সংস্কৃতি, রীতি নীতি ইত্যাদি স্থান পায়। সাংবাদিক বা লেখকরা এক্ষেত্রে ওই সংস্কৃতির সঙ্গে ভাষার নাড়ির যোগ বুঝে সংবাদ পরিবেশন করেন।

সংবাদপত্রের ভাষা খুবই সপ্রতিভ। এখানে ক্রিয়াপদের ব্যবহার খুবই কম। বিশেষ করে সংবাদের শিরোনামে কোনও ক্রিয়াপদ থাকেই না।

সংবাদপত্রের ভাষায় কমা, সেমিকোলন, কোলন ইত্যাদি যতি চিহ্নের ব্যবহার দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদের তুলনায় খুবই কম। বাক্যও খুব ছোটছোট। অনেক সময় একটি শব্দ দিয়েই একটি বাক্য তৈরি করা হয়।

এই ভাষায় অনুপ্রাসের ঝনঝনানি, অলঙ্কারের তীব্রতা এক দম নেই। ভাষার শরীর থেকে মেদ ঝরিয়ে এই ভাষাকে করা হয়েছে নির্মেদ, ঝরঝরে। তাই ৭ই পৌষ বা ১৫ জানুয়ারির বদলে লেখা হয় ৭ পৌষ, ১৫ জানুয়ারি। 'দুর্ঘটনায় ১০ জন মানুষের মৃত্যু' এই বাক্যের বদলে লেখা হয় 'দুর্ঘটনায় মৃত ১০'।

ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদ পত্রের ভাষায় আবেগ উচ্ছ্বাসের কোনও স্থান নেই। যা ঘটছে, ঘটছে বা ঘটতে পারে এমন বিষয়কে সরাসরি উপস্থাপন করার রীতি এখানে লক্ষণীয়।

সংবাদপত্রের ভাষায় গাম্ভীর্যের বদলে ভাবমাধুর্য আছে। বেশরি ভাগ ক্ষেত্রেই হালকা চালে সকলের বোধগম্য করে সংবাদ পরিবেশন করা হয়। তাই লৌকিক শব্দ ছাড়াও বাগধারা, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদির ব্যবহার এখানে অনেকটাই বেশি। সাহিত্যের ভাষায় ভাবগাম্ভীর্য থাকার ফলে একটি বই পড়তে যতটা সময় বা পরিশ্রম লাগে তার অনেক কম সময়েই এই বইয়ের সম পৃষ্ঠার কোনও ম্যাগাজিন বা সংবাদপত্র শেষ করা যায়।

এর ভাষা মানুষের মুখের ভাষা বলেই অত্যন্ত সাবলীল ও বোধগম্য। লেখক, সাহিত্যিকদের মতো এখানে সাংবাদিকরাও প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন শব্দ সৃষ্টি করে চলেছেন। সেটা অবশ্যই হালকা চালে, তা ছাড়া বড় বা গুণিদের নাম ধরে (যেমন সনিয়া বললেন, রবিশঙ্কর এসছিলেন, ধোনি আপনি ইত্যাদি) ডাকার প্রবণতা দেখা যায়। তা ছাড়া সংবাদ পত্রের মাধ্যমেই কোনও একটি বিষয়কে নতুন রূপে উপস্থাপন করার বিষয়টি লক্ষণীয়। যেমন—বইসংক্রান্ত আলোচনায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই ভাবে হেডলাইন থাকে—'বই-তরণী', 'বই-পার্বণ', 'বইপাড়া' ইত্যাদি।

আধুনিক কালে অবশ্য সংবাদ পত্রের জেলা ভিত্তিক সংস্করণ হওয়ার ফলে জেলার পাতাগুলি আঞ্চলিক হয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট জেলায় নির্দিষ্ট সংস্কৃতি অনুযায়ী ভাষা গুরুত্ব পাচ্ছে। যদিও সব জেলার পাতাতেই মানুষের বোধগম্য কথ্যরূপটি স্থান পাচ্ছে।

৩.৩.১২.৪ : বাংলা বিজ্ঞাপনের ভাষা

বিজ্ঞাপন বলতে বোঝায় বিশেষভাবে জ্ঞাপন বা জানানো। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার যোগ অঙ্গাঙ্গী। বিজ্ঞাপন আধুনিক যুগেরই একটি বড় মাধ্যম। বিজ্ঞাপন এখন শিল্পের স্তরে উন্নীত। বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল 'ক্যালকাটা গেজেট' (২৫ মার্চ ১৭৮৪) পত্রিকায়।

সেদিন থেকে আজও বিজ্ঞাপন সৃজনের ধারা অব্যাহত। বিজ্ঞাপনের ভাষা সাহিত্য বা সংবাদপত্রের ভাষা থেকে অনেকটাই আলাদা। যদিও বিজ্ঞাপন, বই বা সংবাদপত্রের পাতাতেই ছাপানো হয়। বর্তমান কালে অবশ্য পত্র-পত্রিকা ছাড়া বেতার, দূরদর্শনেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের ভাষারূপ এই রকম—

বিজ্ঞাপনী ভাষার প্রথম লক্ষ্য পাঠক বা দর্শকদের মনকে আকৃষ্ট করা। এই জন্য চটকদারী বা চমকদারী বা চমক সৃষ্টি কারী শব্দ প্রয়োগ করা হয়। সেই ভাষায় সাহিত্য গুণ কতটা আছে তা দেখার প্রয়োজন বিজ্ঞাপন দাতারা মনে করে না। মানুষকে আকর্ষণ করানোর বিষয়টাই এখানে গুরুত্ব পায়।

ক্রিয়াপদহীনতা বিজ্ঞাপনী ভাষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। কারণ ক্রিয়াপদ বাক্যের গতিকে বেশির ভাগ সময় দুর্বল করে দেয়। এইজন্যই ক্রিয়াপদ তুলে দিয়ে বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শব্দগুলি পর পর বসানো হয়। তবে সব বিজ্ঞাপনই সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়াপদহীনতা ঠিক নয়।

বাংলা বিজ্ঞাপনের শুরুর দিকের ভাষা ছিল বর্ণনামূলক। সংক্ষিপ্ততা ছিল না। শব্দ গঠন, বানান সবই ছিল গতানুগতিক। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞাপনী ভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে চিহ্নিত। এটি এককথায় বাণিজ্যিক ভাষা। তাই এটি ব্যাকরণের নিয়মনীতি মেনে চলে না। দাঁড়ি, কমাহীন ছোট ছোট বাক্যের সাহায্য অনেক অর্থ বুঝিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করাই এই ভাষার লক্ষ্য। প্রতিনিয়ত বিজ্ঞাপনী ভাষায় অসংখ্য শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে, যার অর্থ অভিধানে নেই। শব্দের রকমারিতে এই ভাষা সমৃদ্ধ। বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরেজি বা হিন্দি শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে চমক সৃষ্টিতে এই ভাষা অদ্বিতীয়। অনেক সময় বড় বড় বাংলা বাক্যের বদলে একটি ইংরেজি শব্দের ব্যবহারে এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করা যায়।

বিজ্ঞাপনী ভাষায় সাধু, চলিত শব্দ একই সঙ্গে একই বাক্যে ব্যবহার করা হয়। গতানুগতিক সাহিত্য ভাষা থেকে এটি আলাদা।

কিছু বিজ্ঞাপনের ভাষা তথ্য বহুল তার পাশাপাশি বেশ শ্রুতিমধুর। সেগুলি সংবাদ পত্রের পাতা, বেতার বা দূরদর্শনের পর্দাতেও অত্যন্ত আকর্ষণীয় যেমন—'সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম বোরোলীন'বেতার বা দূর দর্শনে এই বাক্যে সুরসংযোজনায় তা হয়েছে নান্দনিক। ভাষায় কারুকার্যে এটি বহুল পরিচিত।

বিজ্ঞাপনী ভাষা মানেই অল্পেতে অন্যকে আকৃষ্ট করানো। যেহেতু বাণিজ্যের সঙ্গে এই ভাষার গভীর যোগ আছে, তাই অর্থ সাশ্রয় করে নিজের বার্তা অন্যের কাছে পৌঁছানো যায়। মোটকথা অল্পকথায় বেশি বলা। ফলে আবেদনটা হয় শ্রোতা বা পাঠকের কাছে তীক্ষ্ণ, তির্যকভাবে।

এই ভাষা ক্রিয়াহীন, বিরতিহীন, উপমাহীন, অলঙ্কারহীন। এই ভাষায় গুরুত্ব পেয়েছে বিশেষণ। অর্থাৎ বিশেষ্যের গুণবাচক বিশেষণ তুলে ধরতেই এই ভাষার সার্বিক প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। সেটা বিয়ের বিজ্ঞাপনের কোনও উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার বোঝা যায়।

বিজ্ঞাপনের হাত ধরেই বাংলা ভাষার একটি দিক ক্রমশই সাংকেতিক হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি সাহিত্য ভাষা সংবাদপত্রের ভাষা বুঝতে ও যেখানে মানুষ হিমসিম খায়, সেখানে অনায়াসেই বিজ্ঞাপনী ভাষাকে তারা আত্মস্থকরতে পারে। তাই বলা যায় সংবাদপত্রের ভাষার থেকেও বিজ্ঞাপনী ভাষা অনেকেটাই সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।

বিজ্ঞাপনী ভাষার মূল কথা অন্যের মনে কৌতূহল জাগানো। তাই এই ভাষা একদিকে যেমন 'ইনফরমেটিভ'

অন্যদিকে তেমনই 'কমার্শিয়াল'। বাজারি অর্থনীতির সঙ্গে এই ভাষার যোগ লক্ষণীয়। বিশেষ করে পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনে এই ভাষা যে ভাবে ব্যবহৃত হয় তাতে মানুষের শিক্ষা, রুচি, স্বভাব, আদর্শের কোনও মূল্যকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অন্যান্য জিনিসের মতো পাত্রপাত্রীরা এই ভাষার রূপ পেয়েছে ভোগ্যপণ্যে। যা বর্তমান সমাজে অস্বস্তিকরও বটে।

বাণিজ্যের পাশাপাশি এই ভাষায় বিজ্ঞাপিত আবেদন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে একে টেলিগ্রাফিক ভাষাও বলা হয়। নতুন শব্দ, নতুন বাক্য, নতুন উপস্থাপন রীতি সবই ভাষার কারুকার্যতায় গড়া যা সাহিত্য সংবাদপত্রের ভাষা থেকে কয়েক যোজন দূরে।

৩.৩.১২.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।

৩.৩.১২.৬ : আদশ প্রশ্নাবলী

১. গণমাধ্যমের ভাষা বলতে কী বোঝ? সংবাদপত্র, বেতার ও টিভির ভাষার বৈশিষ্ট্যাবলী নিরূপণ করো।

২. 'বিজ্ঞাপন' বলতে কী বোঝ? বাংলা বিজ্ঞাপনী ভাষার বৈষিষ্ট্যাবলী নিরূপণ করো।

পর্যায় গ্রন্থ — ৩

একক -১৩
বাংলা ভাষাচর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিন্যাস ক্রম :

৩.৩.১৩.১ : বাংলা ভাষাচর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩.৩.১৩.২ : বাংলা উচ্চারণ

৩.৩.১৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.৩.১৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.৩.১৩.১ : বাংলা ভাষচর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :

বিভিন্ন কবিতা, গল্প, উপন্যাসের পাশাপাশি বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চায় ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। অনেক সময় মনে হয় রবীন্দ্রনাথের শুধুমাত্র প্রতিভা কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনা বা লেখকসত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তা কিন্তু যথার্থ নয়। কারণ তিনি এসবের পাশাপাশি নিরুচ্চার ভঙ্গিতে বাংলা ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন দিকও চর্চা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ ও রচনা করেছেন। সেগুলি নিম্নরূপ—

১. বাংলা শব্দতত্ত্ব (শেষ সংস্করণ ১৩৯১)

২. শিক্ষা (১৯০৮)

৩. ছন্দ (১৯৩৬)

৪. বাংলা ভাষা পরিচয় (১৯৩৮)

উল্লেখ্য 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' ও 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থ দুটি ভাষার বিভিন্ন দিকও বিশ্লেষণ সম্পর্কিত। 'ছন্দ' গ্রন্থটি কাব্য ভাষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে মৌখিক বা কথ্যভাষা আলোচনার কোনও অবকাশ নেই। আর 'শিক্ষা' গ্রন্থটি মাতৃভাষা ও বিভিন্ন বিদেশি ভাষার আলোচনা বা বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। অর্থাৎ শেষের গ্রন্থদুটি তে লক্ষণীয় ভাষার সঙ্গে অন্যান্য প্রসঙ্গের যোগসূত্র। যাই হোক রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষাতত্ত্বের ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, ছন্দতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব সবদিকই আলোচিত হয়েছে।

বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে তিনি উচ্চারণ, বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণের স্বরূপ, রীতি সবই আলোচনা করছেন। বাংলা শব্দতত্ত্বের কয়েকটি প্রবন্ধ যেমন—

'বাংলা উচ্চারণ', 'স্বরবর্ণঅ', 'বাংলা ভাষার উচ্চারণ' নিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। প্রথমে বলেছেন তিনটি স (শ, ষ, স)-এর উচ্চারণ। বাংলায় সব দন্ত 'স' তালব্য 'শ'-এর মতোই উচ্চারিত হয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন—কষ্ট, ব্যস্ত শব্দ দুটি। এখানে প্রথমটির উচ্চারণ তালব্য 'শ' ও দ্বিতীয়টির দন্তন্য 'স'। আবার 'আসতে

হবে' ও 'আশ্চর্য' শব্দে প্রথমটির উচ্চারণ দন্তন্য 'স' ও দ্বিতীয়টির উচ্চারণ তালব্য 'শ' এর মতো। আধুনিক কালে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী যেমন চমস্কি, হালি প্রমুখ ধ্বনির স্বলক্ষণ সম্পর্কে যে-ধরনের কথা বলেছেন সেগুলি তো একদিক থেকে রবীন্দ্রনাথেরই ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে বক্তব্যের গাণিতিক রূপ। বাংলা 'শব্দদ্বৈত' 'ধ্বন্যাত্মকশব্দ', 'ভাষার ইঙ্গিত' ইত্যাদি প্রবন্ধে তিনি ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন।

বিষয়টি এবারে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ রবীন্দ্রনাথ ধ্বনিতত্ত্বের উপরে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলি—'বাংলা উচ্চারণ', 'একটি প্রশ্ন', 'স্বরবর্ণ অ, এ', 'টা টো টে', 'বীমসের বাংলা ব্যাকরণ', 'ধ্বন্যাত্মকশব্দ', 'বাংলা কথ্য ভাষা', 'বাংলা বানান', 'বানানবিধি', ইত্যাদি। এ ছাড়াও 'বাংলা ভাষা পরিচয়'—

এর দুটি পরিচ্ছেদ তো ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক। যেমন একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আছে ধ্বনিতত্ত্ব ও ছন্দ বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ।

৩.৩.১৩.২ : 'বাংলা উচ্চারণ'

প্রবন্ধে তিনি বাংলা শব্দ উচ্চারণ করার বিভিন্ন নীতির কথা বলেছেন। উচ্চারণে যে বিশৃঙ্খলা আছে সেটা তিনি খতিয়ে দেখেছেন। এবং কিছু নিয়মাবলীও তিনি লিখেছেন। 'একটি প্রশ্ন' প্রবন্ধটিতে ইংরেজি অক্ষরের বাংলা স্বরান্ত সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। 'স্বরবর্ণ অ' এবং 'স্বরবর্ণ এ' প্রবন্ধদ্বয় যথাক্রমে 'অ' স্বরের বিকৃতিও 'এ' স্বরের উচ্চারণ প্রসঙ্গে আলোচ্য। এখানে 'এ' কে অনেক সময় 'অ্যা' উচ্চারণ করা হয় সে কথাও বলা হয়েছে। 'টা টো টে' প্রবন্ধে সংস্কৃত প্রত্যয়ের তিনটি ভিন্নরূপ বাংলা ভাষায় বহু দিন থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে, এই সম্পর্কে তিনি কিছু নিয়ম নীতির সন্ধান করেছেন। এগুলি যে স্বরবিকারের নিয়ম তা তিনি বলেছেন। 'বীমসের বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধটিতে তিনি অনেক ভুল ধরেছেন। অর্থাৎ বীমস বাংলা ভাষার শব্দাবলীর উচ্চারণ বিধি নিয়ে যেসব কথা বলেছেন সেগুলির কথা তিনি এখানে আলোচনা করেছেন। 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধে তিনি তো ওই সব শব্দের প্রকৃতি নির্দেশ করেছেন। 'বাংলা কথ্য ভাষা' প্রবন্ধটি বাংলা ভাষার কথ্য রূপের উপর রচিত। এখানে পুরুষ বচন, বাচ্য, কাল অনুযায়ী কথ্যরূপের সঙ্গে শিষ্টরূপের প্রয়োগগত পার্থক্যের দিক বোঝানো হয়েছে। 'বাংলা বানান' ও 'বানান বিধি' দুটি প্রবন্ধই বানান সম্পর্কিত। 'বাংলা বানান' প্রবন্ধে বাংলা বানানের যে বিভ্রাট দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে সেই সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। আর 'বানানবিধি' প্রবন্ধে বাংলা বানানের সংস্কার সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আলোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তিনি বাংলা ভাষার ধ্বনিগত দোষ—ত্রুটিকে সহজেই অনুধাবন করেছেন। এবং এই অনুযায়ী অনেক সূত্রের মাধ্যমে নয়মাবলীর মাধ্যমে তাঁর ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনা পরিপুষ্ট হয়েছে।

রূপতত্ত্বের আলোচনায় স্থান পেয়েছে বচন, প্রত্যয়, ধাতু, বিভক্তি, লিঙ্গ, ক্রিয়ার রূপ, শব্দমূল ইত্যাদি। রূপতত্ত্বের আলোচনা মূলত 'বাংলা ভাষা পরিচয়', 'শব্দতত্ত্ব' ইত্যাদি গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাংলা বিশেষ্য পদে বহুবচনের প্রভাব অল্পই।'

তাঁর মতে ভাষার ব্যাকরণ বিশেষ্য পদও তাঁর রূপান্তরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। বিশেষণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, 'খাঁটি বাংলায় দুই অক্ষরের বেশির ভাগ বিশেষণ শব্দ হলন্ত নহে'। তিনি বিশেষ পদের প্রয়োগ চাতুর্যের কথাও বলেছেন। সর্বনামকে যেমন বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, তেমনি লিঙ্গ ও পুরুষের সঙ্গে সর্বনামের সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে তাঁর কলমে। অব্যয়ের আলোচনায় তিনি তো 'ও', 'আর', 'এবং'-এর কথা বলেছেন। বাংলা ক্রিয়াপদের

তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে এসেছে মৌলিক ক্রিয়াপদ, যৌগিক ক্রিয়াপদ ইত্যাদির কথা। এবং ক্রিয়াপদের মূল হিসেবে তিনি সংস্কৃত ধাতুকেই দায়ী করেছেন। তাঁর মতে কিছু ক্রিয়াপদ নাম ধাতু থেকে; কিছু ধ্বন্যাত্মক ধাতু থেকে সৃষ্ট। এগুলির তিনি উদাহরণ দিয়েছেন।

'শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক' প্রবন্ধে তিনি 'গাইব' এর বদলে 'গাব', 'রইবে', এর বদলে 'রবে', 'সবই' এর বদলে 'সবে', 'চাইব' এর বদলে 'চাব' ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। 'ক্রিয়াপদের তালিকা প্রবন্ধে তিনি 'হাওয়া', 'থাকা' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের বিশেষ ভঙ্গিগত প্রকৃতি উন্মোচন করেছেন। এর সঙ্গেই অবশ্য এসেছে যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ মূলত বিশেষ্য ও ক্রিয়াযোগে যৌগিক পদ গঠিত হয় এরকম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

ক. বিশেষ্য + ক্রিয়া = মার খাওয়া

খ. ক্রিয়া + ক্রিয়া = করে ফেলা।

অনুজ্ঞার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ দুটি প্রকারের কথা বলেছেন। যথা—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। নঞর্থক ধাতুর বিশ্লেষণে 'না' শব্দের ক্রিয়াপদের রূপ কতটা বৈশিষ্ট্যসম্মত তা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন—'তুমি নেই', 'সে নেই', 'আমি নেই' ইত্যাদি। ক্রিয়াবিশেষণের আলোচনায় তিনি দুটি ক্রিয়াপদ এক সঙ্গে জুড়ে তা তৈরির কথা বলেছেন। যেমন—'হেসে খেলে', 'উঠে পড়ে' ইত্যাদি। বাংলা বহুবচনের রূপ তৈরি তে অনেক উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। যেমন—গুলা, গুলি, রা,গণ ইত্যাদি-র যোগ তো আছেই, তা ছাড়াও তিনি দেখিয়েছেন ঝাক, গোছা, আঁটি, গ্রাস পত্র ইত্যাদি যোগেও বহুবচন গঠিত হয়। বাংলা শব্দদ্বৈতের আলোচনায় তিনি বলেছেন বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়াকে দু'বার উচ্চারণ করলে শব্দদ্বৈতের সৃষ্টি হয় যেমন—'গরমগরম' (বিশেষণ), 'দুয়ারে দুয়ারে' (বিশেষ্য) 'খেয়ে খেয়ে' (ক্রিয়া) ইত্যাদি। 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে তিনি তো দ্বিরুক্তিয় মূলক ধ্বন্যাত্মক শব্দের বৈশিষ্ট্য, প্রয়োগগতদিক, দার্শনিক তত্ত্বসবই বিশ্লেষণ করেছেন। আবার 'স্ত্রী লিঙ্গ' প্রবন্ধে কীভাবে স্ত্রী লিঙ্গ গঠন করা হয়, স্ত্রীবাচক প্রত্যয় সহযোগিতার ব্যাখ্যা ও উদাহরণ আছে। 'বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ' (কারক-বিভক্তি) প্রবন্ধটি বাংলা শব্দের তির্যক রূপের সঙ্গে ক্রিয়া পদের সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এটি মূলত শব্দ ও কারক। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'কারক বিভক্তি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেখানে বিভিন্ন কারকের শ্রেণিবিভাগ ও উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ সহ প্রত্যয়ের রূপবৈচিত্র্য বিশ্লেষিত হয়েছে। 'বিশেষ বিশেষ্য' ও 'বাংলা নির্দেশক' প্রবন্ধদ্বয়ে বিষয়টি বোঝাতে তিনি মূলত 'সামান্য বিশেষ্য' ও 'Article'-এর কথা বলেছেন।

'উপসর্গ সমালোচনা' প্রবন্ধটি বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন দিক থেকে তিনি উপসর্গের বিশ্লেষণ করেছেন।

ভাষাতত্ত্বের অন্যতম দিক যে ছন্দতত্ত্বগত সেকথার রবীন্দ্রনাথ কখনও ভোলেননি। তিনি বাংলা ছন্দ নিয়ে অনেক গবেষণামূলক কাজ করেছেন। এ বিষয়ে তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ছন্দ' (১৩৪৩)। এ ছাড়াও 'সাহিত্যেরপথে', 'বাংলা ভাষা পরিচয়' ইত্যাদি গ্রন্থেও ছন্দ সম্পর্কে কমবেশি আলোচনা আছে। তাছাড়া ছন্দ নিয়ে একাধিক প্রবন্ধও লিখেছেন। যেমন—'বাংলা শব্দ ও ছন্দ', 'ছন্দ ও উচ্চারণরীতি', 'গদ্যছন্দ' ইত্যাদি।

পয়ার ছন্দকে তিনি সবচেয়ে পুরনো বলে মেনেছেন। তাঁর মতে ছন্দ যে কোনও ভাষার নিজস্ব ভঙ্গিকে অনুসরণ করে। এই হিসেবে তিনি বৈদিক ভাষার অক্ষরমাত্রিকতার কথা বলেছেন। বাংলা কাব্যে সাধু ও চলিতরূপে ছন্দ ভাবনায় দুই ধরনের ছন্দে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তা ছাড়া বাংলা ছন্দে হসন্ত সাধনা ছিল তাঁর ভাবনার একটা বড় দিক। তিনি মূল বাংলা ভাষার উচ্চারণের দিকে লক্ষ রেখে ছন্দের বৈচিত্র ঘটাতে চেয়েছিলেন।

৩.৩.১৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।

৩.৩.১৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চায় রবীন্দ্রনাথের অবদান লিপিবদ্ধ করো।

একক -১৪

ভাষাবিজ্ঞান চর্চায়

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিন্যাস ক্রম :

৩.৪.১৪.১ : ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

৩.৪.১৪.২ : সাংস্কৃতিকী

৩.৪.১৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.৪.১৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.৪.১৪.১ : ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় :

সুনীতি কুমারের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অর্থাৎ ১৮৯০-এ। তবে তাঁকে বিংশ শতাব্দীর ভাষাতত্ত্ববিদ হিসেবে ধরা হয়। তিনি মূলত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভাষার বিশ্লেষণ করেছেন। সবকিছুকে যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে বিচার করেছেন। কলেজ জীবন থেকেই তিনি শুধু বাংলা, ইংরেজি বা সংস্কৃত নয় গ্রিক, লাতিন, ফরাসি, জার্মান, হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিয়া, তামিল ইত্যাদি ভাষা ও সাহিত্যের গভীরে ঢোকার চেষ্টা করেন। শুধু ভাষা বা সাহিত্য নয়— ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, চিত্রকলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, দর্শন, ভূগোল ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁর আগ্রহ জন্মায়। তবে ভাষার প্রতিই তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াকালীনই তিনি মাতৃভাষা নিয়ে গভীর চিন্তা করেন। ফলে ভাষাতত্ত্ব চর্চায় নতুন নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অনেক ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থ লিখেছেন। ইংরেজি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য—

১. The Origin and Development of the Bengal Language (1926)

২. A Brief Sketch of Bengali Phonetics (1921)

৩. Bengali SelfTaught (1927)

৪. A Bengali Phonetic Reader (1928)

৫. Indo-Aryan and Hindi (1942)

৬. Languages and Linguistics Problems (1943)

৭. Languages and Literature of Modern India (1945)

৮. Scientific and Technocal Term in Modern Indian Language (1953)

৯. Dravidian (1965)

১০. The people Language and Culture of Orissa (1966)

১১. Phonetics in the study of classical Languages in the East (1967)

১২. Balts andAryan (1967)

১৩. The People Languages and Culture of Orissa (1985).

আবার বাংলা গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

১। বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (১৯২১)

২। ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৪৫)

৩। সরল ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৫৫)

৪। ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা (১৯৪৪)

৫। সাংস্কৃতিকী (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড)

৬। বাঙলা ভাষা প্রসঙ্গ (১৯৭৫)

The Origin and Development of the Bengali Language : ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৬ সালে চর্যাপদকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা নামে প্রকাশ করেন। ফলে চর্যার ভাষা বাংলা কিনা তা প্রামাণ করার কাজ শুরু হয়। O.D.B.L গ্রন্থে সুনীতি বাবু চর্যার ভাষা যে বাংলা তা প্রমাণ করেন।

O.D.B.L গ্রন্থে সুনীতি কুমার ইন্দো— ইউরোপীয় ভাষাগুলিকে কেন্তুম ও সতম ভাষা গুচ্ছে ভাগ করেছেন। কেন্তুমকে তিনি বলেছেন পশ্চিমী গুচ্ছ, আর সতমকে পূর্বী গুচ্ছ। এইগ্রন্থে তিনি বলেছেন—

> "There is again, on proof that primitive Indo Europeans, were a pure and unmixed race."

এর পাশাপাশি তিনি বাংলা ভাষার ইতিহাসও আলোচনা করেছেন। বাঙালি জাতির মূল জাতিগত উপাদান বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন চারটি জাতির মিশ্রণে বাঙালি জাতি গঠিত।

যেমন—

> "Four tribdes, Pundra, Vanga, Radha and Sumha, were the important ones, who gave their names to the various tracts they inhabited."

A Brief Sketch of Bengali Phonetics : বর্ণনামূলকভাষা বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এখানে তিনি

আধুনিক বাংলা ভাষার ধ্বনিগুলিকে এককালিক বা বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্যে সোস্যুরও ব্লুমফিল্ডের বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনার উপর ভিত্তি করে সুনীতি বাবুর এই গ্রন্থটি রচিত। সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা এই গ্রন্থে অনেক স্থানে দেখা গেছে। ১৯১৮ সালে 'Bengali Phonetics' নামে একটি রচনা 'Modern Review' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পুস্তক আকারে এটি 'A Brief Sketch of Bengali Phonetics' নামে প্রকাশ পায়।

'Bengali Self Taught' ও 'A Bengali Phonetics' : গ্রন্থদুটি ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক। এখানে বাংলা ধ্বনির উচ্চারণ, বর্ণ ও ধ্বনির সম্পর্ক, ধ্বনির দৈর্ঘ্য, শ্বাসাঘাত ও সুরতরঙ্গ ইত্যাদির আলোচনা আছে।

Bengali Phonetic Reader : এখানে সুনীতি কুমার ড্যানিয়েল জোনসের পদ্ধতিতে ধ্বনিমূল নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। রচনাটির অংশ বিশেষে তিনি ধ্বনিমূল ধারণা প্রয়োগ করে বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেছেন।

Language and Literature of Modern India : নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিস্তৃত আলোচনা এখানে আছে। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারাও এখানে বিশ্লেষিত। শুধু ভারতীয় আর্যভাষা নয়, অন্য আর্যেতর ভাষার বর্ণনাও এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। আধুনিক ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে একাধিক তথ্য এখানে আছে।

Dravidian : এই গ্রন্থে ভারতীয় আর্যজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে অনার্য দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাতত্ত্বগত দিকের তুলনামূলক আলোচনা আছে।

The People Language and Culture of Orissa : এখানে সুনীতিবাবু শুধু ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেননি। নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে ওড়িয়া ভাষার ক্রম বিস্তারিত রূপে বর্ণনা দিয়েছেন।

ভাষা প্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ : একটি খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ। উচ্চারণ, বর্ণবিন্যাস, ব্যাকরণ বিষয়ে বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতির বর্ণনা এখানে আছে। ব্যাকরণ বিশ্লেষণে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এখানে সুনীতি কুমার সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা ব্যবহার করে বাংলা ভাষার বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। শুধু সংস্কৃত পরিভাষা নয় তাত্ত্বিক আলোচনায় তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য নিয়েছেন। সংস্কৃতের মতোই বাক্যে ক্রিয়াপদের ভিত্তিতে বিভিন্ন কারককে মেনে নিয়েছেন। তবে বাক্যে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সঙ্গে ক্রিয়ার বাকি সম্বন্ধ ছাড়া কারকের আর কোনও পরিচয় তিনি দেননি। কারকের বিভক্তিও তিনি সংস্কৃতের রীতিতেই বিচার করেছেন। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব, ছন্দ ইত্যাদির বিভিন্ন দিক এখানে বিশ্লেষিত।

ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা ঃ ভারতের আধুনিক আর্যভাষাসমুহের বিবরণ তো আছেই। তা ছাড়া ও দ্রাবিড়, কিরাত, নিষাদ ইত্যাদি গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের ঐতিহাসিক বর্ণনার পটভূমিকায় হিন্দি, হিন্দুস্তানি, খড়ি, কেলি, উর্দু ইত্যাদি ভাষার অবস্থান, মান, সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও এখানে আছে। পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার অবস্থান সম্পর্কে ও বিবরণ লক্ষণীয়। বৈদিক ভাষা ও অন্যান্য উপভাষার বিস্তৃত ব্যাখ্যা সুনীতিবাবু দিয়েছেন গ্রন্থটিতে।

৩.৪.১৪.২ : সাংস্কৃতিকী

এই গ্রন্থে সুনীতি কুমার বেদের রচনা কাল নির্ণয় করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে তিনি বেদের রচনাকালকে খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে বলেছেন। মূলত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেই তিনি বেদতথা 'ঋকসংহিতা'র রচনাকালকে খ্রি: পূ: ১৫০০ অব্দে ফেলেছেন।

ভাষার বিশ্লেষণ শুধু নয় সুনীতি কুমার ভারতীয় জাতি, ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়েও ভাবনাচিন্তা করেছেন। এ বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থও লিখেছেন। যেমন—

Kirata-Jana-Kriti: এখানে তিনি ভারতে আগন্তুক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

The Indo Mongolods : এখানে ভোটচিনীয় ভাষা বা মোঙ্গলয়েড ভাষার উৎস ব্যাখ্যা আছে। ভারতের জাতীয় ঐক্য ও হিন্দু সংস্কৃতি, মণিপুরি ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনাও তিনি করেছেন।

বৈদেশিকী : দেশ-বিদেশের প্রচলিত ইতিকথা এ গ্রন্থে আছে। বিশ্বমানব সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক নানা তথ্য এখানে পাওয়া যায়। আয়ারল্যান্ডের আইরিশ জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রসিদ্ধ কাহিনি 'দেরদিউ' ও জার্মানজাতির প্রচলিত উপাখ্যান 'ব্রুনহিল্ড' এবং চৈনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা আলোচিত হয়েছে।

এ ছাড়া ভ্রমণ বিষয়ক দুটি রচনাও তিনি লিখেছেন। যথা—'দ্বীপময় ভারত' ও 'রবীন্দ্র সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ'।

বাংলা ভাষার অভিধান সম্পর্কেও সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বকে তিনি প্রথম বাংলা শব্দসংগ্রহ বলেছেন। আর অভিধান হিসেবে 'চলন্তিকা'র কথা তিনি বলেছেন। এটি চলিত ও সাধুভাষার অভিধান। অভিধানটির পরিশিষ্ট অংশে যে বাংলা ব্যাকরণের রূপটি রাজশেখর বসু দিয়েছেন, তা সুনীতিবাবু প্রশংসা করেছেন।

সুনীতি কুমার সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কেও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। পাণিনির ব্যাকরণকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। পাণিনির মতো সুনীতিবাবুও স্বীকার করেছেন প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে অনার্য উপাদান আছে।

৩.৪.১৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।

৩.৪.১৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অবদান বুঝিয়ে দাও।

পর্যার গ্রন্থ — ৪

একক -১৫
সুকুমার সেনের বাংলা ভাষাচর্চা

বিন্যাস ক্রম :

৩.৪.১৫.১ : সুকুমার সেনের বাংলা ভাষাচর্চা

৩.৪.১৫.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.৪.১৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.৪.১৫.১ : সুকুমার সেনের বাংলা ভাষাচর্চা :

১৯০১ সালে সুকুমার সেন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। আচার্য সুনীতি কুমাররের যোগ্য ছাত্র রূপে ১৯২১ সালে সম্মানিক সংস্কৃতে উত্তীর্ণ হন। এবং ১৯২৩ সালে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ পরীক্ষায় পাশ করেন প্রথম বিভাগে। ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিদ্যায় তিনি ছাত্রজীবনেই প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় আর্য তথা সংস্কৃত ও মধ্যভারতীয় আর্য তথা প্রাকৃত ভাষার অনুশীলন ও গবেষণাতত্ত্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। আচার্য সুনীতি কুমারের যোগ্য উত্তরাধিকার তিনি সর্বাথেই বহন করেছেন।

সুকুমার সেন 'Syntax of Old and Middle Indo Aryan Language' বিষয়ে গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করে 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ. ডি ডিগ্রিতে সম্মানিত হন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল— 'Historical Syntax of Middle and New Indo Aryan'। এ ছাড়া ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলি হল—

১. The Use of cases in tVedic Prose (1929)

২. বাংলা সাহিত্যে গদ্য (১৯৩৪)

৩. ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৩৯)

৪. An Outline Syntax of Middle InAdoyan (1940)

৫. Old Persian Indciption (1941)

৬. A Comparative Grammar of Middle Indo Aryan (1950)

৭. History and Pre-history of Sanskrit (1950)

৮. An Etymological Dictonary of Bengali (1969)

সুকুমার সেনের প্রথম জীবনের রচনা— 'The use of cases in the Vedic Prose' প্রাচীনকালের বৈদিক ভাষার পদগুলিতে কারকের ব্যবহার কেমন ছিল তা নিয়ে এই গ্রন্থটি রচিত। প্রাচীন বৈদিক যুগের বাক্যতত্ত্বও

আলোচনা করেছেন তিনি। তাই এখান থেকেই তাঁর ভাষা জিজ্ঞাসার ব্যাপ্তিপরিলক্ষিত হয়। এছাড়াবৈদিক ভাষার বাক্যগঠন বিষয়েও গবেষণাকরেন।

ভাষা বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড স্যাপিরের মনোলোকে ভাষা ও সাহিত্য ছিল অবিচ্ছন্ন সম্পর্কে যুক্ত। ড. সুকুমার সেন ও সাহিত্যকে দেখেছেন ভাষার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধে যুক্ত করে। 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থে তিনি ভাষা বিশ্লেষণের আলোকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে আজ অবধি বিস্তৃত বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করেছেন। আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানের ধারাও তাঁর আলোচনায় আছে। এই বিশ্লেষণ যথেষ্ট মননশীল।

ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'The Origin and Development of the Bengal Language' গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ। কিন্তু বাংলা ভাষায় লেখা বাংলা ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ব্যাকরণ গ্রন্থ 'ভাষার ইতিবৃত্ত'। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, ভারতীয় ভাষাসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ সম্পর্কে তীক্ষক্ষ্ম, সংযত, বাহুল্যবর্জিত আলোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি অদ্বিতীয়।

প্রাচীন পারসিক ও প্রত্নলিপি শিলা লেখাগুলির আধুনিক সংস্করণ বিশ্লেষণ করে সুকুমার সেন পারসি ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেছেন 'Old Persian Inscription' গ্রন্থে। এই আলোচনা তাঁকে আন্তর্জাতিক বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'Histor and Pre-history of Sankrit' : গ্রন্থে তিনি মূল ইন্দোইউরোপীয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য তথা বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষার জন্মকাহিনি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তারই পাশাপাশি অনুমানের উপর ভিত্তি করে সংস্কৃত ভাষার প্রাগৈতিহাসিক রূপের পুনর্গঠন করেছেন। সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস জানতে এই গ্রন্থটি অসাধারণ

A Comparative of Middle Indo Aryan : মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার পালিও প্রাকৃতের বিভিন্ন স্তরেররূপ বৈচিত্র্য ও তুলনামূলক ব্যাকরণ আলোচিত হয়েছে তাঁর A Comparative Grammar of Middle Indo Aryan : গ্রন্থে। গ্রন্থটি তাঁকে বিশেষজ্ঞদের সামনের সারিতে অধিষ্ঠিত করেছে।

'An Etymological Dictonary of Bengali' : গ্রন্থটি বাংলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অভিধান। এই গ্রন্থটিতে ব্যুৎপত্তি নির্দেশ, কোন নাম থেকে কোন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ও পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমানে তা কী রূপ লাভ করেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন।

বহু বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করলেও আচার্য সুকুমার সেনের একটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা অবশ্যই প্রয়োজন। সেই গ্রন্থটি হল বহু খণ্ডে বিভক্ত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'। তথ্য ও তত্ত্বে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষকদের কাছে আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশের নারী সমাজে ব্যবহৃত উপভাষাগুলির ধ্বনিগত, রূপতত্ত্ব ও ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আচার্য সুকুমার সেন আলোচনা করেছেন তাঁর 'Women's Dialect of Bengali' গ্রন্থে।

এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি নানা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যেমন—'সেকশুভোদয়া' (১৯২৮), 'চর্যাগীতি পদাবলী' (১৯৫৬), 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ১৯৬৩), 'চণ্ডীমঙ্গল' (১৯৭৫), 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' ইত্যাদি। এই প্রবন্ধগুলি ভাষা চর্চার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুকুমার সেন সম্পর্কে বলা যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। তাঁর গভীরতা ও অবদানে বাংলা সাহিত্য আজ সমৃদ্ধ। তিনি কেরি থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক মানুষ, এমনকি উপজাতিদের ভাষাতত্ত্ব

বিচার করেছেন বিভিন্ন রচনায়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে অভিধান রচনা করেছেন। একদিকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এদেশীয় ভাষার ঐতিহাসিক অধ্যয়ন, অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ চর্চায় তিনি অদ্বিতীয়। উল্লেখ্য বঙ্গ দেশে ভাষা বিজ্ঞানচর্চায় এই ধারার সূত্রপাত ভাষাচার্য সুনীতি কুমারের মধ্যে এমন পরিপুষ্ট আচার্য সুকুমার সেনের হাতে।

সবশেষে বলতে হয় সুকুমার সেনের স্বক্ষেত্র ছিল ভাষা ও সাহিত্য। তাই তাঁর ভাষাজিজ্ঞাসা বহুদূর বিস্তৃত হতে পেরেছে। ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এদেশের ভাষাতত্ত্বে অধ্যাপনা ও সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনায় সূক্ষ্মভাবে পাণ্ডিত্যের সূত্রপাত ঘটান ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এই ধারার পূর্ণতা দিয়াছেন ড. সুকুমার সেন। ভাষা সম্পর্কে ড. সেনের ছিল অগাধ দখল। তিনি সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের ভাষা থেকে শুরু করে বৈষ্ণবীয় সাহিত্য, ইসলামীয় গোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে যেমন মাতামাতি করেছেন, তেমনি বর্ধমানের মুচিদের ভাষার দেশেও তাঁর আসা যাওয়া ছিল। ভাষার ক্ষেত্রে বেদ থেকে বটতলা পর্যন্ত তাঁর অবাধ যাতায়াত। তাঁর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি আক্ষ্ম লোচনায় কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ যেমন আছেন, তেমনি আছেন প্রিয়নাথ মুখুজ্জেরা। তবে সুকুমার সেনের সাহিত্যের ইতিহাস কারও কাছে 'তথ্য ভারাক্রান্ত বা 'পাণ্ডিত্য কণ্টকিত' বা 'সাহিত্যে রসহীন' মনে হয়েছে। কিন্তু তাঁর সাহিত্য রসাস্বদন ক্ষমতার পরিচয় অসংখ্য প্রবন্ধে যেমন পাওয়া গেছে, তেমনি সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থেও। অমলেন্দু বসু সুকুমারের ইংরেজি ও বাংলা ভাষাশৈলীর প্রশংসা করেছেন 'জ্ঞানপথিক সুকুমার সেন' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন— 'সুকুমার সেন চমৎকার বাংলা লেখেন, চমৎকার ইংরেজিও লেখেন। পণ্ডিতেরা সব সময়েই ভাষা মাধুরীর অধিকারী হন না। কিন্তু সুকুমার সেনের ইংরেজি যে কতটা সাবলীল বহুধা শক্তিসম্পন্ন সে কথা বুঝতে পারি তাঁর রচিত 'History of Bengali Literature' পড়লে এবং আমার বিশ্বাস যে জওহরলাল নেহরু যে ঐ গ্রন্থ পড়ে প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন তার অন্যতম একটি কারণ সুন্দরশৈলী সম্পন্ন এক ব্যক্তি সুন্দরশৈলী সম্পন্ন অপর এক ব্যক্তির রচনায় অচিরেই আকৃষ্ট হন। ঐ শৈলীগুণ সুকুমার সেনের প্রতিটি বাংলা রচনায় বিদ্যমান এমনকী ভারত কোষ অন্তর্গত utility stanted উপযোগিতা ব্যঞ্জক গদ্যেও। ভাষার সঙ্গে রচনা শক্তির এমন পণ্ডিত জনমহলে বিরল।"

৩.৪.১৫.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।'

৩.৪.১৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা ভাষাতত্ত্বচর্চায় সুকুমার সেনের অবদান আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৬

আই.পি.এ

বিন্যাস ক্রম :

৩.৪.১৬.১ : বাংলা থেকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক ধ্বনিমালার লিপ্যন্তরকরণ (IPA)

৩.৪.১৬.২ : আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালাতে লিপ্যন্তরীকরণের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম

৩.৪.১৬.৩ : আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালাতে লিপ্যন্তরের কিছু দৃষ্টান্ত

৩.৪.১৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.৪.১৬.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.৪.১৬.১ : বাংলা থেকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক ধ্বনিমালার লিপ্যন্তরকরণ (IPA)

পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই একটি বা দুটি ভাষা জানেন। কেউ বা তার চেয়েও কিছু বেশি সংখ্যক ভাষা জানেন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যিনি পৃথিবীর সমস্ত ভাষাই জানেন। কেন না পৃথিবীর এই বিপুল সংখ্যক ভাষার সবগুলি কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। অথচ পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অন্য মানুষের কাছে পৌঁছনোর। অন্য মানুষের ভাষা জানার, বোঝার। এই কারণেই বুদ্ধিমান মানুষ তৈরি করার চেষ্টা করেছে সর্বজনবোধ্য কৃত্রিম বিশ্বভাষা। এই রকমই আর একটি পদক্ষেপ হল আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা। (Internaitonal Phonetic Alphabet)। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা কোনও বিশেষ ভাষার জন্য ব্যবহৃত বর্ণমালা নয়। অধিকাংশ ভাষার বর্ণমালাতেই বক্তব্য পরিবেশনে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন, বাংলাতে একটি শব্দ 'অ্যামন' - কিন্তু লিখতে গেলে লিখতে হয় 'এমন'। 'অ্যা' এই ধ্বনিটি বাংলা বর্ণমালায় গৃহীত হয়নি। 'এ' ধ্বনি দিয়ে সেই কাজ চালানো হয়। কিন্তু এই 'অ্যা' ধ্বনিটি আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় স্থান পেয়েছে।

> *আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা কোন বিশেষ ভাষার জন্য ব্যবহৃত বর্ণমালা নয়। পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অন্য মানুষের কাছে পৌঁছানোর। অন্য মানুষের ভাষা জানার, বোঝার। এই কারণেই বুদ্ধিমান মানুষ তৈরি করার চেষ্টা করেছে সর্বজনবোধ্য কৃত্রিম বিশ্বভাষা। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয় ধ্বনিবিজ্ঞান শিক্ষক সংস্থা। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্থা The International Phonetic Association নামে ফ্রান্স থেকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়। ভাষাবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল জোনস এর প্রধান সংগঠক নিযুক্ত হন।*

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয় ধ্বনিবিজ্ঞান শিক্ষক সংস্থা। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে এই সংস্থা 'The International Phonetic Association' নামে ফ্রান্স থেকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়। ভাষাবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল জোনস এর প্রধান সংগঠক নিযুক্ত হন। বারবার এই আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার (IPA) পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়। বারবার পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে এই বর্ণমালা বর্তমানের রূপ লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা যেহেতু রোমীয় বর্ণমালার কাঠামোর উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে. তাই বাংলা বর্ণমালা রোমীয় বর্ণমালা ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার বর্ণগুলি পাশাপাশি লিখে দেখানো হল —

বাংলা বর্ণ	রোমীয় বর্ণমালার চিহ্ন	বাংলা স্বনিম	IPA চিহ্ন
অ	a	/অ/	/ɔ/
আ	ā	/আ/	/a/
ই	i	/ই/	/i/
ঈ	ī		
উ	u	/উ/	/u/
ঊ	ū		
ঋ	ṛ	/রি/	/rⁱ/ = r⁺
এ	e	/এ/	/e/
ঐ	oi/ai	/ঐ/	/o̯i/
ও	o	/ও/	/o/
ঔ	ou/au	/ঔ/	/ou̯/
এ	e	/অ্যা/	/æ/
ক্	k	/ক্/	/k/
খ্	kh	/খ্/	/kʰ/
গ্	g	/গ্/	/g/
ঘ্	gh	/ঘ্/	/gʰ/
ঙ্	ŋ	/ঙ্/	/ŋ/
চ্	c	/চ্/	/c/
ছ্	ch	/ছ্/	/cʰ/
জ্	j	/জ/	/ɟ/
ঝ্	jh	/ঝ/	/ɟʰ/
ঞ	ñ	/ন/	/n/
ট্	ṭ	/ট/	/ṭ/

ঠ্	th	/ঠ/	/ t^h /
ড্	d	/ড/	/ d /
ঢ্	dh	/ঢ/	/ d^h /
ণ্	n	/ন/	/ n /
ত্	t	/ত/	/ t /
থ্	th	/থ/	/ t^h /
দ্	d	/দ/	/ d /
ধ্	dh	/ধ/	/ d^h /
ন্	n	/ন/	/ n /
প্	p	/প/	/ p /
ফ্	ph	/ফ্/	/ p^h /
ব্	b	/ব্/	/b/
ভ্	bh	/ভ্/	/ b^h /
ম্	m	/ম্/	/ m /
য্	y/j	/জ্/	/ɟ /
র্	r	/র্/	/ r /
ল্	i	/ল্/	/ l /
ব্	w/v	/ব্/	/ b /
শ্	s̃	/শ/	/ ʃ /
ষ্	s	/শ/	/ ʃ /
স্	s	/শ/	/ ʃ /
হ্	h	/হ্/	/ h /
ং	n/m	/ঙ/	/ ŋ /
ঃ	ḥ	/হ্/	/ h /
	n/~		~
ড়	ṛ / ḍ / ɣ	/ড়/	/ +r /
ঢ়	ṛh / ḍh / γh	/ঢ়/	/ r /
য়	y	/য়/	/j/ /é/
ওয়	w	ওয়	/w//óe/

৩.৪.১৬.২ : আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালাতে লিপ্যন্তরীকরণের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম

১। প্রতিটি তাৎপর্যপূর্ণ মূলধ্বনি বোঝাতে একটি মাত্র চিহ্নই ব্যবহৃত হবে।

২। কোনও ধ্বনির জন্যই একের বেশি চিহ্ন ব্যবহৃত হবে না।

৩। বাস্তব বা প্রকৃত উচ্চারণ অনুসারে কোনও ভাষার শব্দকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার সাহায্যে লিপ্যন্তর করা হবে। কোনও ভাষার লিখিত রূপ যাই হোক না কেন, তার উচ্চারণ অনুযায়ী লিপ্যন্তর করাটাই নিয়ম।

৪। ধ্বনির দীর্ঘতা বোঝানোর জন্য 'কোলন' (:) চিহ্নের ব্যবহার। যেমন, ই = i, ঈ = i :

৫। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় বড় হাতের অক্ষর (Capital Letter)-এর ব্যবহার নেই।

৬। ধ্বনির সানুনাসিকতা বোঝাতে স্বরবর্ণের মাথার উপরে '~' চিহ্ন যুক্ত করা হয়। যেমন - পাঁক / pāk /

৭। 'আন্তর্জাতিক ধ্বনিতালিপি' সব সময় দুটি তির্যক রেখা (//) -র ভিতরে থাকে।

৮। যৌগিক স্বর বোঝাতে দুটি স্বরের নিচে ' _ ' চিহ্ন দিয়ে যুক্ত করা হয়। যেমন ঐ (ওই) = o͜i।

৯। নামবাচক বিশেষ্য (Proper Noun) পদের আগে একটা তারকা চিহ্ন দিতে হয়। যেমন - দিল্লি =*/ dilli /।

৩.৪.১৬.৩ : আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালাতে লিপ্যন্তরের কিছু দৃষ্টান্ত

বাংলা শব্দ	রোমীয় বর্ণান্তর	IPA তে বর্ণান্তর
পদ্মলোচন	প্ + অ্ + দ্ + ম্ + অ ল্ + ও + চ্ + অ + ন্ = Padmalocan	পদ্দোলোচোন্ = প্ + অ + দ্ + দ্ + ও + ল্ + ও + চ্ + ও + ন্ = / $p_e$ddolocon /
রাজকন্যা	র + আ + জ্ + ক্ + অ ন্ + য + আ্ = Rājkanyā	রাজ্কোন্না = র্ + আ + জ্ + ক্ + ও + ন্ + ন্ + আ = Kriʃnocɔndro/rajkonna/
কৃষ্ণচন্দ্র	ক্ + ঋ + ষ্ + ণ্ + অ + চ্ অ + ন্ + দ্ + র + অ = Kriṣnachandra	কৃশনোচন্দ্রো = ক্ + ঋ + শ্ + ন্ + ও + চ্ + অ + ন্ + দ্ + র্ + ও = / Kriʃnocɔndro /

৩.৪.১৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ
২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত
৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা
৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)
৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)
৬. সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ
৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে'

৩.৪.১৬.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা কি? সংক্ষেপে এর নাম কি?

২। কোনও ভাষাকে IPA-তে রূপান্তরিত করার শর্তগুলো বিশ্লেষণ করো।

NOTE